আহমদ রফিক

ভাষা আন্দোলন

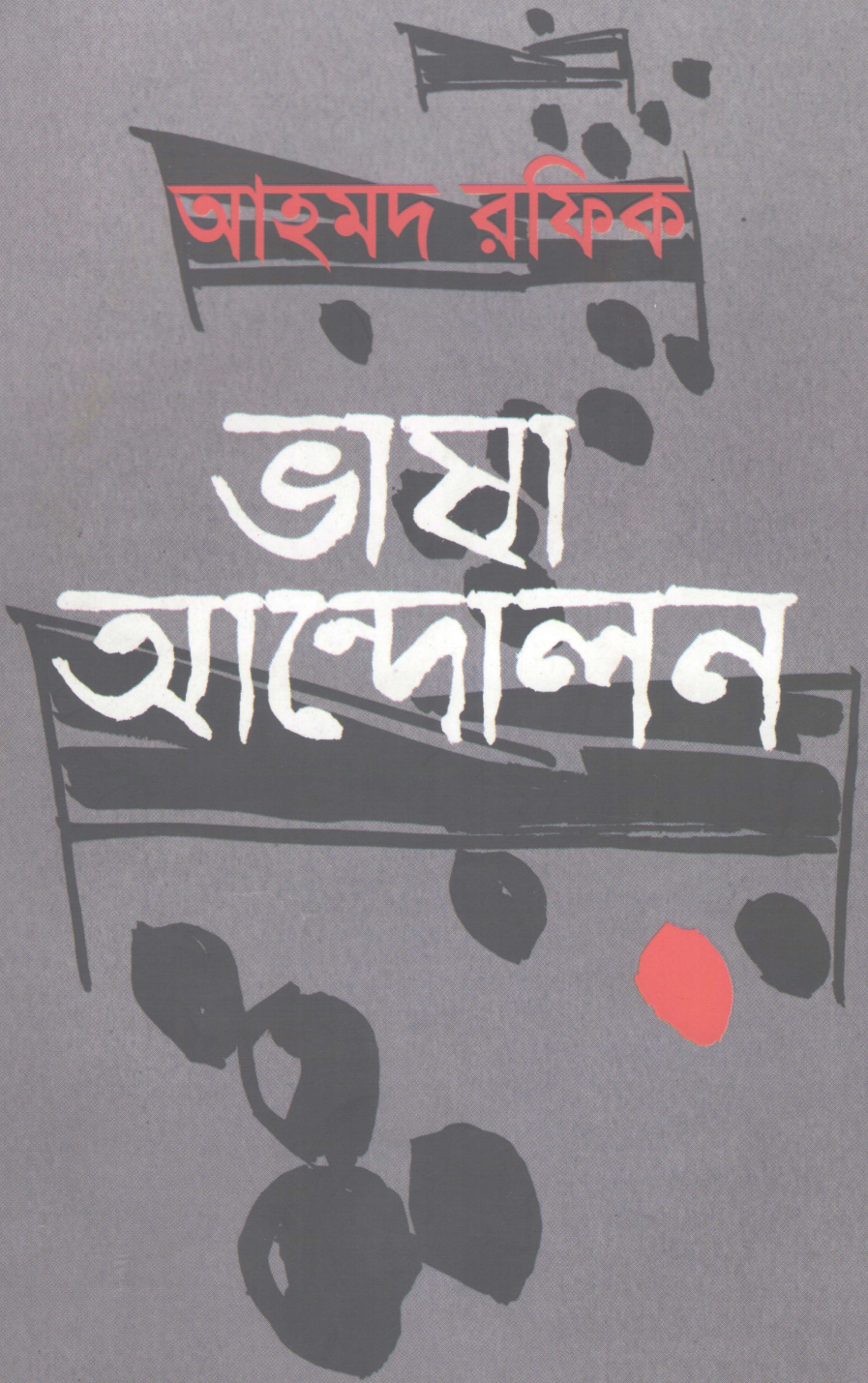

ভাষা আন্দোলন

আহমদ রফিক

প্রথমা
প্রকাশন

তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে
যারা ঐতিহ্য ও ইতিহাসের টানের
নিজেদের বদলে নিয়ে
সময় ও সমাজকে বদলে দিতে চায়

ভূমিকা

ভাষা আন্দোলনের প্রথাসিদ্ধ দীর্ঘ ইতিহাস কয়েকজনের হাতেই লেখা হয়েছে। সেগুলো তথ্যনিষ্ঠ। তা ছাড়া একই বিষয়ে লেখা স্মৃতিচারণামূলক বই সংখ্যায় অনেক। দুঃখজনক যে সেসব বইয়ে অনেক ক্ষেত্রে রয়েছে তথ্যগত ভুল, যা ইতিহাসপাঠকের জন্য বিভ্রান্তি ও অস্বস্তির কারণ হওয়ার কথা। হয়তো বিস্মৃতি বা অন্য কোনো কারণে এমনটা ঘটেছে। ইদানীং ভাষা আন্দোলনবিষয়ক কোনো কোনো রচনায় লক্ষণীয় নতুন প্রবণতা সংগঠনবিশেষের গুরুত্ব বাড়াতে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানোর চেষ্টা। এ ধরনের চেষ্টা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে পাঠক-মহলে বিভ্রান্তি ছড়াতে সাহায্য করছে।

তবু বলি, এসব ঘটনা *ভাষা আন্দোলন* বইটি লেখার কারণ নয়। কেননা, ভাষা আন্দোলনের সঠিক তথ্যনির্ভর ইতিহাস রচনার চেষ্টায় গত তিন দশকে অন্তত গোটা দুই বই তো লিখেছি, এবং সব মিলিয়ে নানামাত্রিক গোটা চার-পাঁচ বই, যা ভাষা আন্দোলনের নানা দিক ও সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাদি তুলে ধরেছে। এগুলোর মধ্যে একটির তৃতীয় সংস্করণে আন্দোলনবিষয়ক বিভ্রান্তিকর তথ্যের জবাবও যুক্ত হয়েছে। তাহলে কেন একই বিষয় নিয়ে আবার লেখা?

এ প্রশ্নের জবাবটাই এ বইয়ের সম্ভাব্য পাঠকদের দিতে চাই। ফেব্রুয়ারি ২০০৯-এ *প্রথম আলোর* সম্পাদক ও উপসম্পাদকের অনুরোধে ফেব্রুয়ারির দিনপঞ্জি হিসেবে ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলি তাঁদের নির্ধারিত ছোটখাটো আকারে লিখতে শুরু করি। বলা চলে, ২১ দিনের রোজনামচায় ভাষা আন্দোলন। খুব সংক্ষেপে সঠিক তথ্যে ভাষা আন্দোলনের একটা ছবি আঁকার চেষ্টা; সেখানে ব্যক্তির মতামত নয়, সঠিক ইতিহাস তুলে ধরাই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য।

পরে *প্রথমা প্রকাশন* লেখাগুলো বই আকারে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক হয়। তাদের উদ্দেশ্য আন্দোলনের ছোটখাটো একটা সহজপাঠ্য সংস্করণ সাধারণ পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া, বিশেষ করে যাঁরা মোটা মোটা ইতিহাস পড়তে বড় একটা আগ্রহী নন। নেপথ্য কারণ ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস ব্যাপক পরিসরে পাঠক-সমাজে প্রচার। সে কারণে ২১ দিনের দিনপঞ্জিতে যুক্ত হয়েছে আরও চারটি পর্ব যাতে আন্দোলনের ইতিহাসে অসম্পূর্ণতা না থাকে। সেই সঙ্গে রয়েছে প্রকাশিত লেখার পরিমার্জন ও পরিবর্ধন, যা বই আকারে প্রকাশের জন্য লেখকের পক্ষে অবশ্যকরণীয় দায়।

ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে এটুকু ভূমিকার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। যথাসম্ভব সহজ ভাষায় সংক্ষেপে লেখা ভাষা আন্দোলনের এ ইতিকথা, জোর দিয়েই বলতে পারি, আন্দোলনের সঠিক তথ্য ও ঘটনানির্ভর ছোটখাটো ইতিহাস, যে লেখার পেছনে রয়েছে নিরপেক্ষ, ইতিহাসনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি। লেখকের প্রত্যাশা, ছোট পরিসরে লেখা এ ইতিহাস ব্যাপক পরিসরে পাঠকদের এ দেশে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের সঠিক ঘটনাবলি জানতে সাহায্য করবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য এ দেশের তরুণ প্রজন্ম, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস জানা যাদের পক্ষে খুবই জরুরি বলে আমরা মনে করি। প্রসঙ্গত বলতে হয় ভাষা আন্দোলনের দিনপঞ্জি লেখার শ্রমসাধ্য কাজ হাতে নিতে উৎসাহ জুগিয়েছেন কবি-গল্পকার জামিল আখতার বীনু।

বইটি প্রকাশের জন্য *প্রথমা প্রকাশন* কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।

আহমদ রফিক

সূচিপত্র

রাষ্ট্রভাষা বাংলা : ইতিহাসের গোড়ার কথা	১১
ভাষার দাবিতে বিক্ষোভ শুরু সাতচল্লিশেই	১৫
বিক্ষোভ থেকে আন্দোলন : ১১ মার্চ	১৯
জিন্নাহ সাহেবের ঢাকা সফর : উর্দু বনাম বাংলা	২২
ভাষা আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিস	২৫
আটচল্লিশ-উত্তর সময় দুই স্রোতে মেশা	২৯
একুশের পটভূমি তৈরিতে ১৯৫১	৩২
একুশে ফেব্রুয়ারি কীভাবে এল	৩৫
বিস্ফোরক দিনটির জন্য দেশজুড়ে প্রস্তুতি	৩৮
যে বাধা না ভাঙলে একুশে কখনো একুশে হতো না	৪১
আমতলা থেকে মেডিকেল ব্যারাকে	৪৪
পুলিশের গুলি ও ইতিহাসের ট্র্যাজেডি	৪৭
গুলিবর্ষণের প্রতিক্রিয়ায় পাল্টে গেল পুরান ঢাকা	৫০
একুশের সন্ধ্যারাতটা শাসকদের জন্য ছিল কালবেলার মতো	৫৩
এলিস কমিশন : বিচারপতির আত্মবিক্রয়	৫৫
ছাত্র-জনতার মিলিত লড়াই	৫৮
আন্দোলন অব্যাহত : প্রতিক্রিয়া ও সম্ভাবনা	৬২
শহীদ স্মৃতি অমর করে রাখতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ	৬৫
শহীদ মিনার স্মৃতির মিনার	৬৭
মূল পরিকল্পনার শহীদ মিনার গড়ে তোলা হোক	৬৯
আক্রমণে আত্মরক্ষার চেষ্টা কোণঠাসা মুখ্যমন্ত্রীর	৭১
কঠোর দমননীতি সত্ত্বেও আন্দোলন চলছে	৭৪
ঢাকার বাইরে ভাষা আন্দোলন	৭৭
একুশের চিত্র রচনায় দেশি-বিদেশি সংবাদপত্র	৮০
কী পেয়েছি একুশের আন্দোলন থেকে	৮৪

রাষ্ট্রভাষা বাংলা : ইতিহাসের গোড়ার কথা

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে, অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার অধিকার আদায়ের জন্য যে লড়াই, তার সূচনা বিক্ষোভে, পরে সংগঠিত আন্দোলনে। ইতিহাসের যেমন ইতিহাস থাকে, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসেরও তেমনি রয়েছে পূর্বকথা, যা এক হিসাবে ইতিহাসেরই অংশ। সে পূর্বকথা অবশ্য প্রধানত রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে তাত্ত্বিক লেখালেখিতে সীমাবদ্ধ এবং তা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস আগে থেকে শুরু, চলেছে পরেও।

এ প্রসঙ্গে আরেকটু পেছনে তাকানো দরকার, জানা দরকার পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পটভূমি। ইংরেজ শাসনে ভারতীয় উপমহাদেশে যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও হানাহানি, তার পেছনে ছিল ইংরেজের সুচতুর শাসননীতি—'ভাগ কর এবং শাসন কর'। অবশ্য সেই সঙ্গে আরও কারণ ভারতের দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অর্থনৈতিক অসমতা ও ধর্মীয় ভিন্নতা। রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতার লোভ ও স্বার্থপরতা ওই বৈষম্য ও ভিন্নতাকে তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিল। উদারতা ও সহিষ্ণুতা তাদের রাজনীতিতে ছিল না বললেই চলে। এর জন্য ভারতের তৎকালীন দুই প্রধান রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কমবেশি দায়ী।

ওই বৈষম্যের ভিত্তিতে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্র গঠনের দাবি ওঠে। ১৯৪০ সালে ওই দাবির প্রকাশ ঘটে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে উত্থাপিত প্রস্তাবে, যা ইতিহাসে 'লাহোর প্রস্তাব' নামে পরিচিত। প্রস্তাবে বলা হয়, ভারতের মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলে দুটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। অবশ্য এগুলোতে থাকবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা। লাহোর অধিবেশনে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন বাংলার স্বনামখ্যাত নেতা এ কে ফজলুল হক।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে ভারতে বাঙালি মুসলমান ছিল শিক্ষায় ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে পেছনে। অবশ্য এ জন্য তাদের দায়ও কম ছিল না। কারণ যা-ই হোক, বাঙালি মুসলমান শ্রেণী-নির্বিশেষে লাহোর প্রস্তাবে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল। তাই ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম লীগের বাক্সে একচেটিয়া ভোট দেয়। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমের মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলোতে মুসলিম লীগ একচেটিয়া বিজয় পায়নি। তাই বলা যায়, সাতচল্লিশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পেছনে মূল ভূমিকা ছিল বাঙালি মুসলমানের। কিন্তু মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে ছিল অবাঙালি মুসলমানের আধিপত্য—নবাব, জমিদার, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের উচ্চবিত্ত শ্রেণীই ছিল সেখানে প্রধান। তারা বাঙালি মুসলমানের উল্লিখিত ভূমিকার দাম দিতে তৈরি ছিল না।

বাঙালি মুসলমানের স্বাধীন স্বতন্ত্র ভূমির স্বপ্নে প্রথম আঘাত পড়ে, যখন ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের সম্মেলনে দলীয় প্রধান মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ লাহোর প্রস্তাবকে বিকৃত করে দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের বদলে এক পাকিস্তান প্রস্তাব পাস করিয়ে নেন। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আবুল হাশিম একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সেই অযৌক্তিক কাজের প্রতিবাদ করেছিলেন। অন্যদিকে হসরত মোহানিসহ আরও দু-একজন প্রতিবাদীকে কথা বলতেই দেননি মুসলিম লীগের একনায়ক সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। দ্বিতীয় আঘাত আসে দেশ বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে আবুল হাশিম ও শরৎচন্দ্র বসুর অখণ্ড তথা যুক্ত বাংলার প্রস্তাব নাকচ হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে।

দেশ বিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা যখন এক নিশ্চিত বাস্তবতা, তখন থেকেই মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের কেউ কেউ বলতে থাকেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।' যেমন—১৭ মে (১৯৪৭) লীগ নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান এক বিবৃতিতে বলেন, 'উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে' (দৈনিক *আজাদ*, ১৯ মে ১৯৪৭)। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে এ ধরনের বক্তৃতা-বিবৃতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন কিছুসংখ্যক বাঙালি লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী। তাঁদের চোখে এমন দাবি অসংগত ঠেকে।

লেখক-সাংবাদিক আবদুল হক দৈনিক *ইত্তেহাদ*-এ 'বাংলা ভাষাবিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক প্রবন্ধ (দুই কিস্তিতে) লিখে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার যোগ্যতা তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে তুলে ধরেন (*ইত্তেহাদ*, ২২ ও ২৯ জুন ১৯৪৭)। এরপর ৩০ জুন দৈনিক *আজাদ*-এ প্রকাশিত 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' নামের প্রবন্ধে জনাব আবদুল হক একইভাবে বাংলার যোগ্যতা প্রতিপন্ন করে লেখেন : 'যেদিক থেকেই বিবেচনা করা যাক না কেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবিই সবচেয়ে বেশি।' রীতিমতো সোজাসাপটা কথা।

সাপ্তাহিক *মিল্লাত* পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে (২৭ জুন ১৯৪৭) বলা হয়, 'মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য কোনো ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে বরণ করার চাইতে বড় দাসত্ব আর কিছু থাকিতে পারে না।' সম্পাদকীয় নিবন্ধটিতেও বাংলা রাষ্ট্রভাষার পক্ষে যুক্তিতথ্য তুলে ধরা হয়। এ ছাড়া আরও কয়েকজন সাংবাদিক দেশ বিভাগের আগেই বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে সোচ্চার হন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হানাহানি, রক্তপাত, নিরীহ মানুষের মৃত্যু এবং লীগ নেতাদের রাজনৈতিক মনোভাব বুঝতে পেরে পাকিস্তান আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট কিছুসংখ্যক উদারমনা, গণতন্ত্রী নেতা-কর্মী বিকল্প সম্ভাবনার কথা ভাবতে থাকেন। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের মূল সংগঠন মুসলিম লীগ ও তার অধিনায়ক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কোনো সংগঠন তৈরি তখনকার পরিস্থিতিতে একেবারেই অসম্ভব ছিল। কারণ, বাঙালি মুসলমান সে সময় স্বতন্ত্র ভুবন পাকিস্তানের স্বপ্নে বিভোর, 'জিন্নাহ' নামের জাদুতে মন্ত্রমুগ্ধ।

তবু জুন সাতচল্লিশে কামরুদ্দীন আহমদ ঢাকায় এসে গণ আজাদী লীগ নামের যে রাজনৈতিক সংগঠন দাঁড় করান, তার মূল ভিত্তি ছিল ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং এর রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা। তাঁর কথা, পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে, তা সেখানকার মানুষই ঠিক করবে। আর একান্তই যদি কেন্দ্র গঠিত হয়, তাহলে দুই দেশের রাষ্ট্রভাষাই কেন্দ্রের রাষ্ট্রভাষা হবে; যেমন—বেলজিয়াম, কানাডা, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি দেশে রয়েছে। কামরুদ্দীন আহমদের এ উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ, মহম্মদ তোয়াহার মতো জনা কয় বামপন্থী যুবক (কামরুদ্দীন আহমদ: *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, দ্বিতীয় খণ্ড)।

এটা ছিল মূলত রাজনৈতিক দিক থেকে সাংগঠনিক প্রয়াস, বাংলা রাষ্ট্রভাষার বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই ওই প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত ছিল। একই সময় আতাউর রহমান, শহীদুল্লা কায়সার, আখলাকুর রহমান প্রমুখ প্রগতিবাদী রাজনৈতিক কর্মী কলকাতায় বসেই পাকিস্তানে একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক যুব সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। তাঁরা অবশ্য দেশ বিভাগের পর ঢাকায় এসে স্থানীয় গণতন্ত্রী, প্রগতিবাদী যুবক ও দু-একজন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। যেমন—মহম্মদ তোয়াহা, নজমুল করিম, অলি আহাদ, তসদ্দুক আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ সমমনা যুবনেতা। এ ছাড়া কামরুদ্দীন আহমদ তো ছিলেনই। জুলাই থেকে চেষ্টা শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে অনেক সরকারি বাধাবিপত্তির মুখে যে কর্মী সম্মেলন হয়, তাতে গণতান্ত্রিক যুবলীগ নামের সংগঠনের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হয়। সেখানে যুবকদের সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও উন্নতির ঘোষণার পাশাপাশি বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিও

উচ্চারিত হয় (বদরুদ্দীন উমর: *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড)।

বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিক আবদুল হকের মতে, 'সে সময় খ্যাত-অখ্যাত অনেকে পত্রপত্রিকায় ভাষা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অধিকাংশ লেখকই রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন।' এভাবেই পাকিস্তানের জন্মলগ্নে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে কিছুসংখ্যক বাঙালি লেখকের সাহসী বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে; অনেকটা ইতিহাসের পূর্বকথার মতো। এ ধারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরও অব্যাহত থেকেছে।

ভাষার দাবিতে বিক্ষোভ শুরু সাতচল্লিশেই

যে আবেগ ও স্বাপ্নিক মুগ্ধতা নিয়ে শ্রেণী-নির্বিশেষে বাঙালি মুসলমান চোখ বন্ধ করে পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল তাতে সীমাবদ্ধ পরিসরে হলেও সেই বিশ্বাসে চিড় ধরা বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। ইতিহাসের ধারায় ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের অবসান এবং দেশীয় রাজনীতিকদের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর। এর পূর্বশর্ত ছিল ভারত বিভাগ। সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের রক্তে ভেজা পথে জন্ম নেয় ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র (ডোমিনিয়ন)। এ বিভাজনে শাসক ইংরেজের রাজনীতি ও কূটনীতির প্রভাব ছিল যথেষ্ট।

বিদেশি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ভাষায়, 'অদ্ভুত রাষ্ট্র' পাকিস্তানের দুই অঞ্চল পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ছিল হাজার মাইলের ভৌগোলিক ব্যবধান। দুই অংশের মধ্যখানে ভিন্ন রাষ্ট্র ভারতের অবস্থান। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক পরিচয় ছিল 'পূর্ববঙ্গ', পরে তার নাম হয় 'পূর্ব পাকিস্তান'। বলার অপেক্ষা রাখে না যে জাতিসত্তা ও ধর্মকে অযৌক্তিকভাবে একাকার করে নিয়ে অর্জিত পাকিস্তানকে ঘিরে বাঙালি মুসলমান তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির স্বপ্ন দেখেছিল, এবং সেটা শ্রেণী-নির্বিশেষে সবাই।

আগেই বলা হয়েছে, স্বল্প পরিসরে হলেও সে স্বপ্নে ভাঙনের সূচনা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাস কয়েক আগে থেকেই। এর কারণ অবাঙালিপ্রধান পাকিস্তানি শাসকশ্রেণীর একচেটিয়া ক্ষমতা ধরে রাখার বাসনা এবং সেই সঙ্গে বাঙালিদের প্রতি অযৌক্তিক বিরূপতা। সেই সঙ্গে ছিল বাংলা ও বাঙালির প্রতি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ। রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিটি পদক্ষেপে তারা বাঙালি-স্বার্থের প্রশ্নে অদূরদর্শিতা ও একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। তৈরি করেছে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য। পূর্ববঙ্গ ও বাঙালি হয়ে ওঠে সেই বৈষম্যের শিকার।

এর প্রতিক্রিয়া ছিল স্বাভাবিক। পাকিস্তানি শাসকেরা প্রতিটি পদে, বিশেষ করে ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার কারণ ঘটিয়েছে। নয়া রাষ্ট্র

পাকিস্তানে সদ্য প্রকাশিত এনভেলাপ, পোস্টকার্ড, মনি অর্ডার ফরম, ডাকটিকিট, রেল টিকিট ইত্যাদিতে লেখা ছিল উর্দু ও ইংরেজিতে; বাংলা অনুপস্থিত। স্বভাবতই ঢাকার ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, এমনকি সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভ দেখা দেয়। সেই ক্ষোভের প্রথম প্রকাশ সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে, সঙ্গে রাজনীতি-সচেতন ছাত্রসমাজ।

নীলক্ষেত ব্যারাকে বসবাসরত সরকারি কর্মচারীদের একটি বিশাল অংশ ব্যারাক প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে উল্লিখিত বৈষম্যমূলক সরকারি আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিও এসে যায়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুষ্ঠিত এসব জমায়েত, সভা ও ছোটখাটো মিছিলের প্রতিবাদ সংঘটিত হয় ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে, অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যে। 'সবকিছুতে বাংলা চাই, উর্দুর সঙ্গে বিরোধ নাই', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, উর্দু বাংলা ভাই ভাই' ইত্যাদি স্লোগানের মধ্য দিয়ে ক্ষুব্ধ মানুষগুলোর প্রতিবাদ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটে। উল্লেখ্য, এ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া প্রকাশের পেছনে কোনো রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগ বা চেষ্টা জড়িত ছিল না।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে সংগঠিত প্রতিবাদের প্রকাশও একই বছরের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে। করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে (২৭ নভেম্বর ১৯৪৭) পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর পক্ষে গৃহীত সুপারিশ প্রস্তাব ঢাকায় ছাত্র-শিক্ষক ও সমাজের সচেতন অংশকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। প্রতিবাদে ৬ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভার পেছনে বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগ ছিল উল্লেখযোগ্য। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আবুল কাসেম এবং বক্তৃতা করেন মুনীর চৌধুরী, কল্যাণ দাশগুপ্ত, এ কে এম আহসান প্রমুখ।

ছাত্রসভার মূল দাবি ছিল পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি এবং পূর্ববঙ্গে সরকারি ভাষা ও শিক্ষার বাহনরূপে বাংলাকে যথাযথ মর্যাদা দান। তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচারে ছাত্ররাই নয়, এ উপলক্ষে নীলক্ষেত ও পলাশী ব্যারাকের সরকারি কর্মচারীদের প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠান ও ছাত্রমিছিলে যোগদান নিঃসন্দেহে সাহসী ঘটনা। সভা শেষে বিশাল ছাত্রমিছিল সচিবালয়, মন্ত্রী ভবন এবং মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন 'বর্ধমান হাউস'-এর সামনে বিক্ষোভে সমবেত হয়। স্লোগান ওঠে : 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'উর্দুর জুলুম চলবে না' ইত্যাদি।

ছাত্র-শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারীদের রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে সংগঠিত প্রতিবাদ-বিক্ষোভের তাৎপর্য বুঝতে পারেনি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। বরং স্থানীয় প্রশাসন পুরান ঢাকার আদি বাসিন্দাদের মধ্যে অপপ্রচার চালিয়ে তাদের বাংলাবিরোধী করে তোলে। কিন্তু তাতে ছাত্রদের মনোবলে চিড় ধরেনি; বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ও কলেজ ছাত্রাবাসগুলো ঘিরে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্রসমাজ ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে থাকে।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার বিষয়ে ছাত্রসমাজ ও সংশ্লিষ্ট লোকজনের আবেগ ও সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া প্রকাশের পরও সরকারি নীতির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি; বরং থেকে থেকে শাসকগোষ্ঠীর তরফে নানা উপলক্ষে উচ্চারিত হয়েছে একই কথা: 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। ব্যক্তিজীবনে মাতৃভাষার প্রভাব যেমন তারা বুঝতে চায়নি, তেমনি বুঝতে চায়নি ভাষিক জাতীয়তার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক গুরুত্বের সঙ্গে রাষ্ট্রভাষার গভীর সম্পর্কের দিকটি। তাই তারা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু বাঙালি জনগোষ্ঠীর ভাষিক দাবির প্রতি চরম অবহেলা দেখিয়েছে।

বহুভাষিক জাতিসত্তা অধ্যুষিত রাষ্ট্রে রাষ্ট্রভাষার সঙ্গে নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির গভীর সম্পর্ক থাকে। তাই বিজাতীয় উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হলে শিক্ষিত বাঙালি সমাজ যে পিছিয়ে পড়বে, সে আশঙ্কা সচেতন বাঙালি শিক্ষিত সমাজের ছিল বলেই তাদের কারও কারও লেখায় এই বিশেষ দিকটি সুস্পষ্টভাবে উঠে আসে। তাদের আশঙ্কা যে ভুল ছিল না, সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণে তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

জাতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রভাষার তাত্ত্বিক ও বাস্তব দিক নিয়ে তাই যেমন বিভাগ-পূর্বকালে বাংলার পক্ষে প্রবন্ধাদি ও সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে, তেমনি লেখা হয়েছে দেশ বিভাগের পর থেকে। যেমন—মাসিক *কৃষ্টি* পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় (১৩৫৪) ড. মুহম্মদ এনামুল হক বাংলার পক্ষে লিখতে গিয়ে আক্ষেপ করে বলেন, 'উর্দু বাহিয়া আসিবে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মরণ—রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু।' প্রায় একই রকম সাহসী ও বিচক্ষণ উক্তি ড. কাজী মোতাহার হোসেনের। *সওগাত* অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (১৩৫৪) বাংলা বনাম উর্দু নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা শেষে তিনি এই বলে মতামত প্রকাশ করেন: 'বাংলা এবং উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।' প্রবন্ধটি এর আগে তমদ্দুন মজলিস প্রকাশিত পুস্তিকায় ছাপা হয়েছিল। ওই পুস্তিকায় প্রকাশিত ছোট একটি নিবন্ধে আবুল মনসুর আহমদ লেখেন, "উদুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি 'অশিক্ষিত' ও সরকারি চাকুরীর 'অযোগ্য' বনিয়া যাইবেন।"

জাতীয় জীবনের এ বাস্তবতা সম্পর্কে বাঙালি শিক্ষিত শ্রেণী ক্রমেই যে সচেতন হয়ে উঠছিল, *ঢাকা প্রকাশ*-এর একটি সংবাদ প্রতিবেদন থেকে তা বুঝতে পারা যায়। পত্রিকাটিতে (৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭) বলা হয় যে পূর্ববঙ্গের সচিবালয়ে প্রায় সব কটি উচ্চপদে রয়েছেন অবাঙালি মুসলমান। এসব নিয়ে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের মধ্যে যে অসন্তোষ, তা আরও প্রকাশ পেয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের একজন অবাঙালি লেকচারারকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সেক্রেটারি পদে নিয়োগ দেওয়ার ঘটনায়।

সাতচল্লিশ থেকে শুরু করে গোটা পাকিস্তানি আমলে অবাঙালি শাসকগোষ্ঠী বরাবরই বাঙালি শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে, বিশেষ করে

উচ্চ পদে বা গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে, সেনাবাহিনীতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে; যেমন কেন্দ্রে, তেমনি পূর্ববঙ্গেও উচ্চ প্রশাসনের ক্ষেত্রে। স্বভাবতই শিক্ষিত বাঙালির সরকারের প্রতি অসন্তোষ বেড়েছে, বেড়েছে সাতচল্লিশ-পরবর্তী সময়ে ভাষা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন।

পাকিস্তানি শাসকশ্রেণী যেমন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য অনড় অবস্থান নিয়েছিল, তেমনি বাংলা রাষ্ট্রভাষার অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বাঙালি ছাত্রসমাজের একাংশও ছিল আপসহীন। বিচ্ছিন্নভাবে, সংগঠনগতভাবে রাষ্ট্রভাষার দাবি জোরালো করে তোলার চেষ্টা চলেছে। সেই লক্ষ্যে ডিসেম্বরের শেষ দিকে (বশীর আল হেলাল : *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*) তমদ্দুন মজলিসের অফিসে বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মী ও ছাত্র প্রতিনিধিদের বৈঠকে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, আহ্বায়ক মনোনীত হন মজলিসের নূরুল হক ভূঁইয়া। সদস্য আবুল কাসেম, মহম্মদ তোয়াহা, নঈমদ্দিন আহমদ, শামসুল আলম, অলি আহাদ, আবুল খায়ের, শওকত আলী, ফরিদ আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী প্রমুখ বিভিন্ন মতাদর্শের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

বিক্ষোভ থেকে আন্দোলন : ১১ মার্চ

সাতচল্লিশের নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে যে ভাষা-বিক্ষোভের সূচনা, প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ তাতে যথেষ্ট শক্তিসঞ্চার করতে পারেনি, আন্দোলন গড়া তো দূরের কথা। অবশ্য এর মধ্যেই ভাষার পক্ষে পথচলার উপলক্ষ তৈরি হয়ে যায়। পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৮) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে পরিষদে ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে গ্রহণের জন্য সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। কিন্তু গণপরিষদের বাঙালি-অবাঙালি মুসলিম লীগ সদস্যদের সমবেত বিরোধিতায় ২৫ ফেব্রুয়ারি ওই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। তাঁদের বিরোধিতার মূল কথা ছিল, 'মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে ও দেশের সংহতি রক্ষার জন্য পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একটি, এবং তা উর্দু।'

গণপরিষদের এ মনোভাবে ঢাকার ছাত্রসমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সব স্থবিরতা মুহূর্তে কেটে যায়। শুরু হয় বৈঠকের পর বৈঠক। ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার শিক্ষায়তনগুলোতে ধর্মঘট পালিত হয়। ওই দিন স্কুল-কলেজ, হল-হোস্টেল থেকে আসা ছাত্ররা আর্টস বিল্ডিং প্রাঙ্গণে জড়ো হয়। সেখানকার ছাত্রসভায় সরকারি ভাষানীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভা শেষে যথারীতি মিছিল; স্লোগান ওঠে, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।'

এরপর ২৮ ফেব্রুয়ারি এক বৈঠকে ১১ মার্চ দেশব্যাপী প্রতিবাদী আন্দোলনের সূচনা দিবস হিসেবে স্থির করা হয়। বৈঠকের উদ্যোগ নেয় তমদ্দুন মজলিস ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। আন্দোলন সফল করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধারার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলে। এবং ছাত্রাবাস ও বিভিন্ন মতের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদের নিয়ে ২ মার্চের বৈঠকে নতুন করে দ্বিতীয় দফায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এবারও আহ্বায়ক হন তমদ্দুন মজলিসেরই সদস্য শামসুল আলম।

১১ মার্চের কর্মসূচি ঠিক করার জন্য এরপর দফায় দফায় সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক চলে। মার্চের ৪, ৫ ও ১০ তারিখে অনুষ্ঠিত আলোচনা বৈঠকে কর্মসূচির

চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়। নবগঠিত সংগ্রাম পরিষদ এবার ব্যাপক ভিত্তিতে বহুদলীয় হওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে বিভিন্ন মতাদর্শের দ্বন্দ্ব ঠিকই উপস্থিত থাকে, যা আন্দোলনের পক্ষে দুর্বলতা হিসেবে গণ্য হওয়ার মতো। পরবর্তী পর্যায়েও এমনটাই দেখা গেছে। তবে এ কথাও সত্য যে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে হল-হোস্টেলের রাজনীতি-সচেতন ছাত্রদের ভূমিকাই ছিল প্রধান এবং তারাই ছিল শক্তির উৎস। অবশ্য সংগ্রাম পরিষদে ছিল তমদ্দুন মজলিসের প্রাধান্য।

নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ১১ মার্চ সচিবালয়ের বিভিন্ন গেটে এবং নীলক্ষেত ও পলাশী ব্যারাক, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, রমনা পোস্ট অফিসসহ বিভিন্ন স্থানে পিকেটিং শুরু হয়। এ পর্যায়ে নেতা-কর্মীদের অনেকে পুলিশের লাঠির আঘাতে ও সরকারের পোষা গুন্ডাবাহিনীর আক্রমণে আহত হন, মহম্মদ তোয়াহাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। গ্রেপ্তার হন অনেকে। তবু আন্দোলন চলতে থাকে। এবং তা বিভিন্ন জেলায় ও কোনো কোনো শহরে এমন তীব্রতায় ছড়িয়ে যায় যে মুখ্যমন্ত্রী শঙ্কিত হয়ে ওঠেন।

অব্যাহত আন্দোলন ক্রমে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে ভেবে বিচলিত মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সংগ্রাম পরিষদের কাছে আপসরফার ভিত্তিতে আন্দোলন বন্ধ করার প্রস্তাব পাঠান। অনেক দেনদরবার শেষে ১৫ মার্চ উভয় পক্ষের মধ্যে আট দফার শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ওই আট দফার মধ্যে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে সুপারিশ-প্রস্তাব গ্রহণের কথাও ছিল। চুক্তি স্বাক্ষরের পর সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলন স্থগিত হওয়ার ঘোষণা দেয়।

কিন্তু আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা ওই চুক্তি মেনে নিতে রাজি হয়নি। এমনকি ছাত্র-জনতাকে চুক্তির কথা জানাতে গিয়ে অধ্যাপক আবুল কাসেম ছাত্র-জনতার বিক্ষোভের মুখে পড়েন। মহম্মদ তোয়াহা এ সময় ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। 'চুক্তি এখনো চূড়ান্ত হয়নি'—এ কথা বলে তিনি তাদের শান্ত করেন। তাদের দাবিতে পরদিন ১৬ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট অব্যাহত থাকে এবং ১৭ মার্চ শুধু শিক্ষায়তনে ধর্মঘট চলে (বদরুদ্দীন উমর, বশীর আল হেলাল, প্রাগুক্ত গ্রন্থ)। তবে শেষ পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিত করা হয়। ১১ মার্চের কর্মসূচি ঢাকার বাইরে রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, যশোর, খুলনা, দৌলতপুর, ময়মনসিংহ, জামালপুর, ভৈরব, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন শহরে পালিত হয়।

আন্দোলনের ব্যাপকতা ছাড়াও বিশেষ যে কারণে মুখ্যমন্ত্রী নিজ উদ্যোগে শান্তিচুক্তির প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তা হলো পাকিস্তানের স্থপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর আসন্ন পূর্ববঙ্গ সফর। রাষ্ট্রপ্রধানের সফরকালে অব্যাহত ছাত্র আন্দোলন মুখ্যমন্ত্রীর জন্য স্বস্তিদায়ক হতো না। আবার কারও মতে, আন্দোলন বন্ধ করতেই তিনি তড়িঘড়ি করে রাষ্ট্রপ্রধানকে ঢাকায় আনার ব্যবস্থা করেন। কারণ যা-ই হোক, জিন্নাহ সাহেবের ঢাকা সফর উপলক্ষে সংগ্রাম পরিষদকেও অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আন্দোলন স্থগিত করতে হয়।

বিস্ময়কর যে এমন এক নাজুক পরিস্থিতির শান্তিচুক্তিকে অধ্যাপক আবুল কাসেম আন্দোলনের 'বিজয়' হিসেবে আখ্যায়িত করেন, যা আদতে বিজয় ছিল না; ছিল জোড়াতালির আপসরফা। আর ছাত্রদের চোখে ওই আপসরফা ছিল আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। তারা আন্দোলন স্থগিত করতে চায়নি। এমনকি মহম্মদ তোয়াহাও একপর্যায়ে আন্দোলন স্থগিত করার বিরুদ্ধে ছিলেন। কারণ, আন্দোলন একবার স্থগিত করলে পরিস্থিতিবিশেষে তা সচল করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে ঠিকই মার্চের অসম্পূর্ণ আন্দোলনের পর ভাষার দাবিতে একটি সফল আন্দোলন পড়ে তুলতে বায়ান্নর ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ প্রায় চার বছর অপেক্ষা করতে হয়। এর জন্য সংগ্রাম পরিষদের মূল নেতাদের অদূরদর্শিতা দায়ী।

১১ মার্চের আন্দোলনের সফলতা-ব্যর্থতার মূল্যায়ন করতে গেলে কিছু অপ্রিয় সত্য বলতে হয়। সংগ্রাম পরিষদের যেসব নেতা আন্দোলন স্থগিত করা শান্তিচুক্তিতে 'বিজয়' দেখেছিলেন, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি; অথবা বুঝেও জিন্নাহ সাহেবের সফরকে আন্দোলনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন। তাই যা ঘটার, তা-ই ঘটেছে। রাষ্ট্রপ্রধানের সফর নিরুপদ্রব হয়েছে। এবং সফর শেষে যেমন জিন্নাহ সাহেব, তেমনি মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনও সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিনামা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছেন। গণপরিষদে এরপর বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাব এদেরই বিরোধিতায় বাতিল হয়ে গেছে। ঘটনা প্রমাণ করে, রাজনীতি-সচেতন জনতা ও বামপন্থী ছাত্ররা যা বুঝতে পেরেছিল, সংগ্রাম পরিষদের আপসবাদী নেতারা তা বুঝতে ভুল করেছিলেন।

প্রসঙ্গত, ১১ মার্চের আন্দোলনে সক্রিয় মূল সংগঠকদের সম্পর্কে বশীর আল হেলালের একটি মন্তব্য গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচ্য। তাঁর মতে, 'মার্চের এই আন্দোলনে ফজলুল হক হল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও মেডিকেল কলেজের ছাত্র ও ছাত্রনেতারাই বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তবে সহসভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও শামসুল আলম ছাড়া সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের নেতৃস্থানীয় আর কোনো ছাত্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না' (পৃ. ২২৮)।

অন্যদিকে বদরুদ্দীন উমরের মতে, 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ, মুসলিম ছাত্রলীগ এবং সাধারণ ছাত্রসমাজই আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে' (পৃ. ১২৬)। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ একুশের ভাষা আন্দোলনেও এই সাধারণ ছাত্রসমাজই ছিল আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি। সঙ্গে ছিল যুবলীগ ও বামপন্থী ছাত্রকর্মী এবং তাদের নেতারা।

জিন্নাহ সাহেবের ঢাকা সফর : উর্দু বনাম বাংলা

পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকা সফরে আসেন। এ সফর পূর্বনির্ধারিত হলেও আমাদের বিশ্বাস, এর উদ্দেশ্য ছিল এক ঢিলে দুই পাখি মারা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববঙ্গের জনসাধারণকে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎদান এবং সেই সঙ্গে তাঁর বিশাল জনপ্রিয়তার চাপে বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবি নস্যাৎ করা। কারণ, তখনো এ দেশের মানুষ 'কায়েদে আজম' বলতে আবেগে অন্ধ।

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি যে তাঁর মনে প্রচণ্ড সমস্যা হয়ে ধরা ছিল, এর প্রমাণ তাঁর প্রতিটি বক্তৃতায় উর্দু রাষ্ট্রভাষার পক্ষে জবরদস্ত মতামত পূর্ববঙ্গবাসীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া। এমনকি সেই সূত্রে সমস্যাজর্জরিত পূর্ববঙ্গে সংঘটিত আন্দোলন, বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ—সবকিছুই রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ হিসেবে চিহ্নিত করা। তাঁর অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তার কথা জানা ছিল বলেই পূর্ববঙ্গবাসীর যুক্তিসংগত প্রতিবাদের ওপর পাথর চাপা দিয়ে তিনি ঢাকা সফর শেষ করেন।

পূর্ববাংলার মাটিতে পা রেখে পাকিস্তানের এই স্থপতি তিনটি জনগুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন। যেমন ঢাকায় রেসকোর্সের বিশাল জনসমুদ্রে, তেমনি কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এবং পাকিস্তান বেতারে—প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি একই সুরে কথা বলেন। এসব বক্তৃতায় মূল কথা ছিল : পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, কমিউনিস্ট ও বিদেশি চরদের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হওয়া রাষ্ট্রদ্রোহের শামিল এবং দলে দলে মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে জাতির খেদমতে আত্মনিয়োগ করা। তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রবিরোধীদের তিনি কঠোর হাতে দমন করবেন। সরকারের সমালোচনা তাঁর চোখে হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রদ্রোহ। পাকিস্তানের পরবর্তী শাসক ও রাষ্ট্রপ্রধানেরা জিন্নাহর তৈরি করে দেওয়া পথ ধরেই হেঁটেছেন। এবং রাষ্ট্র ও সরকারকে ভিন্ন অস্তিত্বে দেখতে শেখেননি। গোটা পাকিস্তানি শাসনামলে রাষ্ট্রনায়কেরা রাষ্ট্রদ্রোহ শব্দটার চমকপ্রদ সদ্ব্যবহার করেছেন। জেল, নির্যাতন, জুলুম, হত্যা—কিছুই বাদ যায়নি।

রেসকোর্সের বক্তৃতায় পাকিস্তানের স্থপতি বাংলার বিরুদ্ধে এবং উর্দুর পক্ষে কথাগুলো বেশ জোরালোভাবে তুলে ধরেন। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে এবং ছেচল্লিশের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পক্ষে বাঙালি মুসলমানের সমর্থন ছিল এককাট্টা। কথিত পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে রাজনীতির ভাগ্যনির্ধারক ওই নির্বাচনের ফলাফল ছিল মিশ্র ধরনের। মুসলিম লীগের একচেটিয়া প্রভুত্ব তাতে ছিল না। সীমান্ত প্রদেশে তো খান আবদুল গফফার খানের দল ও কংগ্রেস মিলে সরকার গঠন করেছিল।

সম্ভবত মুসলিম লীগের অন্যান্য অবাঙালি রাজনৈতিক নেতার মতো জিন্নাহ সাহেবের মধ্যেও বাঙালি-বিরূপতা অনুপস্থিত ছিল না। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকায় ছাত্রদের আন্দোলনের খবর নিশ্চয়ই তাঁকে জানানো হয়েছিল। আর সে জন্যই তাঁর জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ছাত্রদের মতামত ও আন্দোলনে পাথর চাপা দিতে তৈরি হয়েই তিনি ঢাকায় আসেন এবং পাথুরে দৃঢ়তা নিয়ে উর্দু রাষ্ট্রভাষার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। কিন্তু বাঙালি ছাত্রসমাজকে তিনি চিনতে ভুল করেছিলেন।

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে উর্দুর পক্ষে তাঁর মতামত শোনার পর রেসকোর্সের জনসমুদ্রে প্রতিবাদের গুটিকয় বুদ্‌বুদের বেশি কিছু দেখা যায়নি। জনসভায় উপস্থিত কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্যে অবশ্য মতের মিল পাওয়া যায় না। সাঈদ হায়দারের মতে, প্রতিবাদ উচ্চারণের বদলে ছাত্রসমাজের একাংশ সভাস্থল ছেড়ে চলে যায়। যাওয়ার পথে সাজানো তোরণে কিছু ভাঙচুরও করে। অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন যে জিন্নাহ সাহেবের ভাষাবিষয়ক বক্তব্যের পর তাঁদের কিছু কর্মী ও ছাত্র 'নো নো' বলে চিৎকার করে ওঠে এবং সভায় হইচই শুরু হয়ে যায় (একুশের সংকলন, বাংলা একাডেমী, ১৯৮০)।

কিন্তু ওই জনসভায় উপস্থিত কমিউনিস্ট কর্মী সরদার ফজলুল করিম সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলেছেন। একুশের সংকলনে প্রকাশিত স্মৃতিচারণায় (১৯৮০) তিনি বলেন : "জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতার দিন আমি রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত ছিলাম।...জিন্নাহ সাহেব উর্দুতে ভাষণ দেন। বক্তৃতা করতে করতে এক জায়গায় তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কমিউনিস্ট আছে, তোমাদের মধ্যে গুপ্তচর আছে, তোমাদের তারা বিভ্রান্ত করছে। আমি বলছি, ভাষার ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন উঠেছে তাতে উর্দু, কেবল উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' জিন্নাহ সাহেবের ভাষণ শোনার পর ছাত্ররা এতই মর্মাহত হয়েছিল যে হলে ফেরার পথে (সংবর্ধনার জন্য তৈরি) তোরণ তারা ভেঙে ফেলে। অনেকে বলেছেন, জিন্নাহ সাহেব রেসকোর্সে ভাষণ দানকালে ভাষার প্রশ্নে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তার প্রতিবাদ সেখানেই হয়েছিল। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। আমি একজন সচেতন কর্মী হিসেবেই সেখানে গিয়েছিলাম...সেখানে কোনো বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ আমি লক্ষ করিনি।"

কিন্তু ২৪ মার্চ কার্জন হলে বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে জিন্নাহ সাহেব আবারও যখন উর্দু রাষ্ট্রভাষার পক্ষে কথা বলেন, তখন উপস্থিত ছাত্রদের একাংশ থেকে প্রতিবাদ উচ্চারণ 'নো নো নো' সবাইকে চমকে দেয়। কার্জন হলে উপস্থিত সরদার ফজলুল করিমও একই কথা বলেছেন। কার্জন হলে জিন্নাহ সাহেব ইংরেজিতে বক্তৃতা করেছিলেন। প্রতিবাদ উচ্চারণের মুখে একটুক্ষণ চুপ থেকে যথারীতি তিনি তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন।

কার্জন হলে 'নো নো' উচ্চারণ পাকিস্তানের সর্বাধিনায়ককে বুঝিয়ে দিয়েছিল, ছাত্রসমাজে তাঁর একাধিপত্যের অবসান ঘটতে চলেছে। ঢাকার রাজনৈতিক মহল তাদের কায়েদে আযমের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা মুখ বুজে হজম করেছিল, কোনো প্রতিবাদ করেনি। একমাত্র ব্যতিক্রম শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক। জিন্নাহ সাহেবের অগণতান্ত্রিক ও বাংলাবিরোধী বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে হক সাহেব ২৩ মার্চ এক বিবৃতি দেন। দৈনিক *আজাদ* তির্যক শিরোনামে (হক ছাহেবের হুঙ্কার/কায়েদে আজমের প্রতি জঘন্য আক্রমণ) তা ছাপে।

সেদিন সন্ধ্যায় জিন্নাহ সাহেব সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ করেন, কিন্তু তিনি তাঁর অবস্থান থেকে একটুও সরে আসেননি। প্রতিনিধিদলে ছিলেন কামরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাসেম, মহম্মদ তোয়াহা, শামসুল হক, অলি আহাদ প্রমুখ। এরপর তিনি ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেন, কিন্তু অবস্থা আগের মতোই। পূর্ববঙ্গ সফরের শেষ পর্যায়ে বেতার বক্তৃতায় তিনি পূর্বোক্ত বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করেন।

আজকাল কেউ কেউ জিন্নাহ সাহেবকে গণতন্ত্রী প্রমাণ করতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতার (১১ আগস্ট ১৯৪৭) কথা উল্লেখ করে থাকেন—'এখন থেকে কেউ আর মুসলমান বা হিন্দু নন, সবাই পাকিস্তানি' ইত্যাদি। কিন্তু ঢাকা সফরে এসে একাধিক বক্তৃতায় তিনি প্রমাণ করেন যে তিনি অহংবোধে আক্রান্ত একনায়ক এবং অগণতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক এক রাষ্ট্রনায়ক।

জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতার ফলে লীগ নেতাদের মনোবল বেড়েছিল সন্দেহ নেই। মওলানা আকরম খাঁ ৫ এপ্রিল (১৯৪৮) *ষ্টার অব ইন্ডিয়ার* প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে তিনি রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কায়েদে আযমের অভিমত সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। তাঁর মতে, উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।

অন্যদিকে যে ছাত্রসমাজ একসময় চোখ বন্ধ করে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও তাঁর মুসলিম লীগের প্রতি সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছে, জান বাজি রেখে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য লড়েছে, ঢাকা সফরে তাঁর বক্তৃতা শুধু সেই ছাত্রসমাজেই নয়, জনসাধারণের মধ্যেও তাঁর জনপ্রিয়তা কমিয়ে দিয়েছিল (বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫)। ভাষার প্রশ্নে এভাবেই জিন্নাহ সাহেব নিজের ভাবমূর্তি নিজেই নষ্ট করেন।

ভাষা আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিস

যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের তত্ত্বগত ও সাংগঠনিক তৎপরতার দুটি দিক থাকে। ভাষা আন্দোলনও এর ব্যতিক্রম নয়। অনেক সময় আন্দোলনের তাত্ত্বিক দিক লেখালেখির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যেমন পেয়েছে ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে, অনেকটা বহুকথিত রাম জন্মানোর আগে রামায়ণ লেখার মতো। ভাষা আন্দোলনের তাত্ত্বিক পর্বটিকে আন্দোলনের পটভূমিও বলা চলে। সাতচল্লিশ সালের জুন-জুলাই থেকে নভেম্বর অবধি বাংলা রাষ্ট্রভাষার পক্ষে লেখা প্রবন্ধাদি ওই পটভূমি তৈরি করে। দৈনিক পত্রিকা '*ইত্তেহাদ, আজাদ, মিল্লাত* বিভাগ-পূর্বকালে ও পরে বাংলার পক্ষে রাষ্ট্রভাষাবিষয়ক নিবন্ধাদি প্রকাশ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মাসিকপত্র *কৃষ্টি* ও *সওগাত*-এ অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হয়। স্থানীয় পত্রিকা *ঢাকা প্রকাশ* সংবাদ পরিবেশন ও সম্পাদকীয় মন্তব্যের মাধ্যমে এ বিষয়ে ভূমিকা রাখে। তমদ্দুন মজলিস প্রকাশিত পুস্তিকা *পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা-না উর্দুতে* সংকলিত প্রবন্ধ তিনটিও ভাষা প্রসঙ্গে একই কারণে উল্লেখযোগ্য।

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট। পাকিস্তান ও তার স্থপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে ঘিরে বাঙালি মুসলমানের মনে ছিল স্বাপ্নিক মুগ্ধতা। পাকিস্তানি নেতাদের সবাই তখন উর্দু রাষ্ট্রভাষার পক্ষে কথা বলে চলেছেন। এ অবস্থায় বিপরীত স্রোতে বাংলা রাষ্ট্রভাষার পক্ষে শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলা সহজ ছিল না। তবু এর মধ্যে সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে মুসলিম লীগের প্রবল প্রতাপের মধ্যে ঢাকায় সাতচল্লিশের জুনে কামরুদ্দীন আহমদের চেষ্টায় গঠিত হয় গণ আজাদী লীগ, এরপর চেষ্টা চলে প্রগতিবাদী যুব সংগঠন গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠনের। সেপ্টেম্বরে গঠিত হয় সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সংগঠন পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস, মূলত অধ্যাপক আবুল কাসেমের উদ্যোগে।

প্রধানত রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও বাংলার ব্যবহার ওই সংগঠনে সর্বাধিক গুরুত্ব পেলেও মতাদর্শগত দিক থেকে পাকিস্তানে ইসলামি সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন ছিল মজলিসের মূল লক্ষ্য। তবে এ কথাও সত্য যে ভাষার প্রশ্নে গণ আজাদী লীগ ও

গণতান্ত্রিক যুবলীগের তুলনায় শুরুতে তমদ্দুন মজলিস ছিল অনেক বেশি সক্রিয়। কিন্তু বিরাজমান রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতির কারণে রাষ্ট্রভাষার দাবি নিয়ে মজলিস এককভাবে বেশিদূর এগিয়ে যেতে পারেনি। মজলিসের নেতাদের তৎপরতাও যে শুরুতে আলাপ-আলোচনা ও তাত্ত্বিক লেখালেখিতে সীমাবদ্ধ ছিল, তা মজলিসপ্রধান অধ্যাপক কাসেমের স্মৃতিচারণামূলক লেখা থেকে বোঝা যায়।

আগস্ট থেকে নভেম্বর। সংগঠনগত কোনো ভিত্তি না থাকা সত্ত্বেও বাংলা ভাষার ব্যবহার ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে প্রথম প্রতিবাদী বিক্ষোভ ঘটে সরকারি কর্মচারীদের তৎপরতায়। সদ্য প্রকাশিত পোস্টকার্ড, এনভেলাপ, মনিঅর্ডার ফরম ইত্যাদিতে ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলা না থাকায় মর্মাহত নীলক্ষেত ব্যারাকের সরকারি কর্মচারীদের উদ্যোগে তাঁদের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় সভা-সমাবেশ, পরে মিছিল। মিছিলে উচ্চারিত স্লোগান—'সবকিছুতে বাংলা চাই', 'উর্দুর সঙ্গে বিরোধ নাই', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি। কিছুসংখ্যক ছাত্রও ওই মিছিলে যোগ দেয়। এ বিক্ষোভ ঘটে ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে। এ ঘটনার গুরুত্ব বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল না হওয়া সত্ত্বেও উর্দুপন্থীরা ভাষিক তৎপরতার উপলক্ষ জুগিয়ে দেয়। ২৭ নভেম্বর (১৯৪৭) করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর সুপারিশ প্রস্তাব হয়ে ওঠে উপলক্ষ। ঢাকার ছাত্রদের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে সভাপতিত্ব করেন মজলিসপ্রধান অধ্যাপক আবুল কাসেম। মজলিস ও যুবলীগের কর্মীরা এতে যোগ দেন। সভা শেষে ছাত্রকর্মীদের মিছিল ও ভাষার পক্ষে যথারীতি স্লোগান।

পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূলে আসার পরিপ্রেক্ষিতে তমদ্দুন মজলিসের অফিসে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ডিসেম্বরের শেষ দিকে গঠিত (বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*) ওই সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন মজলিসের সক্রিয় কর্মী নূরুল হক ভূঁইয়া। এ সভায় কিছুসংখ্যক অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবীসহ গণতান্ত্রিক যুবলীগ ও তমদ্দুন মজলিসের নেতা-কর্মী, ছাত্রলীগের ভিন্ন ধারার কর্মী এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সংগ্রাম পরিষদের সদস্য হন অধ্যাপক আবুল কাসেম, মহম্মদ তোয়াহা, শামসুল আলম, নঈমুদ্দিন আহমদ, ফরিদ আহমদ, শওকত আলী, আবুল খায়ের, আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী প্রমুখ।

কিন্তু সংগ্রাম পরিষদ বহুদলীয় হওয়া সত্ত্বেও তমদ্দুন মজলিসপ্রধান রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বাংলার দাবিতে আন্দোলন সংঘটনে সফল হয়নি। আটচল্লিশের প্রথম দিকে নঈমুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হওয়ার পর বাংলার পক্ষে সাংগঠনিক শক্তি কিছুটা বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে চেষ্টা ছিল

প্রগতিবাদী ছাত্র-যুবনেতাদের, যাতে সম্মিলিতভাবে ভাষার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলা যায়। এ নীতির প্রকাশ ঘটে ১৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৮) প্রকাশিত একটি বিবৃতি ও ইশতেহারে, যাতে স্বাক্ষর রয়েছে অলি আহাদ ও সরদার ফজলুল করিম থেকে নঈমুদ্দিন আহমদ, আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী, আবুল কাসেম, নূরুল হক ভূঁইয়া প্রমুখর।

ইশতেহারের মূল বক্তব্য: 'আমরা পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছি, তারা যেন বাংলা ভাষার স্বীকৃতির জন্য আগাইয়া আসেন।...মনে রাখা উচিত বাংলাব্যাপী এক আন্দোলন গড়িয়া তোলা ছাড়া বাংলাভাষা যথাযোগ্য স্থান পাইবে না।' তবু মজলিসপ্রধানের বরাবর অভিযোগ: 'অতিপ্রগতিবাদীরা আন্দোলনে যোগ দেয়নি, বরং আন্দোলন স্যাবোটাজ করার চেষ্টা করেছে।' এ অভিযোগ যে সঠিক নয়, বিচ্ছিন্ন বা সংগঠিত আন্দোলনে যুক্ত নেতৃস্থানীয় ছাত্র-যুবাদের রাজনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়।

এমনকি বোঝা যাবে ১১ মার্চে সংঘঠিত ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্বে সংগ্রাম পরিষদের পুনর্গঠন, মূল আন্দোলনে মজলিস-বহির্ভূত নেতাদের ভূমিকা, জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতার পর আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের অনীহা ও তাদের অযৌক্তিক বামবিরোধিতা ইত্যাদি ঘটনার বিশ্লেষণে। মার্চের আন্দোলন স্থগিত করার জন্য মজলিসের আগ্রহ এবং আন্দোলন স্থগিত করে 'বিজয়' ঘোষণা আর সে উপলক্ষে মজলিসপ্রধানের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ ইত্যাদি ঘটনা থেকেও মার্চের আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পূর্বোক্ত ভাষাবিক্ষোভ ও আন্দোলনের অতি সংক্ষিপ্ত বয়ান শেষে বলা চলে যে ভাষা আন্দোলনের একেবারে প্রাথমিক পর্বে তমদ্দুন মজলিসের সক্রিয় ভূমিকা সত্ত্বেও মতাদর্শগত সংকীর্ণতার কারণে আন্দোলনের সম্মিলিত প্রয়াসের ক্ষেত্রে মজলিস পিছিয়ে পড়ে। বামপন্থীদের প্রতি অসহিষ্ণুতাও আরেকটি কারণ। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে কয়েকটি নির্ভরযোগ্য মতামত তুলে ধরাই বোধ হয় যথেষ্ট। যেমন, 'সূচনাকালে ভাষাসংক্রান্ত বাস্তবসম্মত ও গণতান্ত্রিক প্রস্তাব রেখেও' তমদ্দুন মজলিস যে আন্দোলন থেকে পিছিয়ে পড়েছিল, সে সম্পর্কে বশীর আল হেলাল মনে করেন, 'সংগঠন হিসাবে তমদ্দুন মজলিস পরে আর ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে প্রথম পর্বের মতো যুক্ত থাকতে পারেননি' (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ১৮৩)। বিষয়টা বোধ হয় পারা না-পারার নয়, যুক্ত থাকতে চাওয়া না-চাওয়ার।

এ সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বাংলা একাডেমীকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন: 'ভাষা আন্দোলন ক্রমে বামপন্থী প্রগতিবাদী সমাজতন্ত্রী কর্মী, নেতা ও দলসমূহের হাতে চলে যায়। এই সব দল-নিয়ন্ত্রিত আন্দোলনকে সমর্থন জুগিয়ে সমাজতন্ত্রীদের স্বার্থকে পোষণ বা সাহায্য করা তাদের আদর্শবিরোধী ছিল, তারা বিশ্বাস করতেন ইসলামের বিপ্লবী সম্ভাবনায়' (বশীর, পৃ. ১৮৩)।

প্রথম দিককার সংগ্রাম পরিষদ ও তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা সম্পর্কে আবদুল মতিনের বক্তব্য খুব ভিন্ন নয়। তাঁর মতে, 'এ সময়ে নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিসের প্রাধান্য আন্দোলন বিকাশের অন্তরায় হয়ে দেখা দিতে থাকে। কারণ তমদ্দুন মজলিসের লক্ষ ছিল পাকিস্তানে একটি ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং এই উদ্দেশ্য সামনে থাকার কারণে ভাষার মতো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়কে তাদের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণার বাইরে নিয়ে যেতে পারেননি' (*ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও তাৎপর্য*, পৃ. ৪৭)।

একই বিষয়ে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন : 'তমদ্দুন মজলিস আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে, বিশেষত যখন তা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তখন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিন্তু মার্চের প্রথম দিক থেকে আন্দোলন রাজনৈতিক চরিত্র পরিগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে তমদ্দুন মজলিসের গুরুত্ব এবং তাদের নেতৃত্বের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে' (প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬)। দেখা যাচ্ছে, আটচল্লিশের মার্চের আন্দোলন নিয়ে তমদ্দুন মজলিসের কৃতিত্বের দাবি ভিত্তিহীন। এমনকি বায়ান্ন-পূর্ব বছরগুলোতে একুশের প্রস্তুতিপর্বে মজলিসকে বিশেষ কোনো ভূমিকা রাখতে দেখা যায়নি। তাই দুঃখজনক যে সম্প্রতি ভাষা আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের কৃতিত্ব নিয়ে অনেক কিছু লেখা হচ্ছে, যা আসলেই ইতিহাসের বিকৃতি।

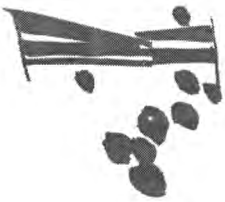

আটচল্লিশ-উত্তর সময় দুই স্রোতে মেশা

অশেষ সম্ভাবনা সত্ত্বেও ১১ মার্চের (১৯৪৮) ভাষা আন্দোলন তার অকালমৃত্যু ঠেকাতে পারেনি। এর আপাত-কারণ পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা সফর এবং সেই সূত্রে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদিত শান্তিচুক্তি। কিন্তু এর নেপথ্যে রয়েছে সংগ্রাম পরিষদে নানা মতাদর্শভিত্তিক নেতৃত্বে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সংগঠনবিশেষের পিছুটান। সে ক্ষেত্রে এমন আশঙ্কাও কাজ করেছে যে আন্দোলন যে তীব্রতা নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে, তাতে এর নিয়ন্ত্রণ বামপন্থীদের হাতে চলে যেতে পারে। কাজেই বিশেষ উপলক্ষে সরকারের সঙ্গে আপসরফাই শ্রেয়।

তখনকার সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচারে তেমন আশঙ্কার খুব একটা বাস্তব ভিত্তি ছিল না। ছাত্রদের বড়সড় অংশ এবং জনসাধারণের মধ্যে অন্ধ পাকিস্তানপ্রীতি তখনো প্রবল। বিরাজমান সাম্প্রদায়িক চেতনা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতা তার প্রমাণ। তবে এ কথাও ঠিক যে এর মধ্যেই উদারপন্থা, গণতান্ত্রিক চেতনা এবং প্রগতিবাদিতা ছাত্র-যুবাদের মধ্যে ধীরেসুস্থে হলেও ক্রমবর্ধমান। এবং এ প্রভাব মার্চের আন্দোলনে দেখা গেছে। হয়তো তাই উদার গণতন্ত্রী হিসেবে পরিচিত তাজউদ্দীন আহমদও আন্দোলন স্থগিত করে চুক্তি সম্পাদনের পক্ষে ছিলেন না। আর বামপন্থী মহম্মদ তোয়াহা তো ননই। এমনকি শেখ মুজিবুর রহমানও আন্দোলনের পক্ষেই ছিলেন। তবু সংশ্লিষ্ট প্রধান সংগঠনগুলোর চাপে এবং জনা কয়েক রাজনীতিকের পরামর্শে আন্দোলন স্থগিত করা হয়। রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা রক্ষা করা বলে কথা।

স্বভাবতই যা ভাবা গিয়েছিল, তা-ই ঘটেছে। আটচল্লিশ থেকে একান্ন পর্যন্ত নতুন করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে কোনো বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে তোলা যায়নি। ডানপন্থীদের পিছুটানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শাসকশ্রেণীর ফ্যাসিস্ট-সুলভ দমননীতি এবং নানা ষড়যন্ত্রের খেলা। নানা সুযোগ-সুবিধাসহ উর্দুবাদীদের সামনে এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চলেছে তাদের প্রচার ইসলামের নামে, পাকিস্তান রক্ষার নামে।

সর্বোপরি ছিল 'জিন্নাহ ফ্যাক্টর'। সাধারণ মানুষ তখনো তাঁর মুগ্ধ সমর্থক। ব্যতিক্রম কিছুসংখ্যক ছাত্র-যুবা এবং গণতান্ত্রিক ও প্রগতিবাদী রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী।

তাই ১৯৪৯ সালের ১১ মার্চ পালনের চেষ্টা সত্ত্বেও ছাত্র ফেডারেশনের নেতা-কর্মীরা পুলিশের দাপটে এবং ব্যাপক ছাত্র সমর্থনের অভাবে রাজপথে দাঁড়াতে পারেনি। দাঁড়াতে পারেনি নাদেরা বেগম, তকিউল্লাহ, নাসির আহমদ প্রমুখর নেতৃত্বে পরিচালিত ছোটখাটো বিক্ষোভ মিছিল। বাহাউদ্দিন চৌধুরী, ইকবাল আনসারি খান হেনরি, মৃণালকান্তি বাড়ড়ি, আবদুস সালাম, সৈয়দ আফজল হোসেন প্রমুখ তরুণ ছাত্রের উদ্দীপনাও কাজে আসেনি। অন্যরা এগিয়ে না আসায় সেবার ১১ মার্চ পালন ব্যর্থ হয়ে যায়।

কিন্তু এর প্রভাব হয়তো কিছুটা হলেও ছাত্রসমাজকে স্পর্শ করে থাকবে। তাই ১৯৫০ সালেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ১১ মার্চ আন্দোলন দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়। এবং ওই ছাত্রসভায় নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। ছাত্রনেতা আবদুল মতিন হন কমিটির আহ্বায়ক। চেষ্টা চলে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি সক্রিয় করে তোলার। কিন্তু নানা কারণে আন্দোলনের পরিস্থিতি তৈরি করা যায়নি।

আটচল্লিশের আন্দোলনের পর প্রায় চার বছরের দীর্ঘ সময়টাকে একুশের প্রস্তুতিপর্ব বলা চলে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের তীব্রতা লক্ষ করেই বোধ হয় শাসকশ্রেণী দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ দূষিত করার চেষ্টা চালায়। এবং সে লক্ষ্যে কিছুটা সফলও হয়। এর প্রমাণ পরবর্তী সময়ে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং রাজনৈতিক দিক থেকে বামপন্থা দমনের নামে জেলে ও জেলের বাইরে কর্মীদের ওপর বর্বর নির্যাতন। রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে বন্দীদের ওপর গুলি চালিয়ে হত্যা, দেশের বিভিন্ন জেলে বন্দীহত্যার মতো বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠেনি। এমনই ছিল সে সময় কমিউনিস্ট-বিরূপতা।

একই সঙ্গে বাংলাবিরোধীদের নানাভাবে চাঙা করে তোলা হয়। ধর্মীয় জাতীয়তায় বিশ্বাসী সাহিত্যিক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীদের তৎপরতা ছিল তখন লক্ষ করার মতো। বিশেষ করে 'বাবায়ে উর্দু' ড. আবদুল হক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমান, মওলানা আকরম খাঁ প্রমুখর বক্তব্য ও তৎপরতায় উর্দুর অবস্থান ও ধর্মীয় ধ্যানধারণা বেশ জোর পায়ে চলতে থাকে। অবাঙালি-বাঙালি শাসকগোষ্ঠীর পরিকল্পনায় জোরদার হয়ে ওঠে ভাষাবিষয়ক ষড়যন্ত্র, বিশেষ করে আরবি হরফে বাংলা লেখার চেষ্টা, উর্দু শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কর্মকাণ্ড। কেন্দ্রীয় বাজেট, প্রাদেশিক বাজেট এদিক থেকে অবিশ্বাস্য উদারতার পরিচয় রাখে। আশ্চর্য যে হরফবিষয়ক উদ্ভট কর্মকাণ্ডে উদ্যোগী ছিলেন আশকার ইবনে শাইখ, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইনের মতো বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ।

এ ধরনের কিছু ঘটনা, বলা চলে শাসকগোষ্ঠীর অদূরদর্শিতার ফল বাংলা দাবির পক্ষে প্রেরণা জোগায়। যেমন আটচল্লিশে, তেমনি পঞ্চাশে পাকিস্তান গণপরিষদের অগণতান্ত্রিক আচরণ ভাষার দাবিকে সামনে নিয়ে আসে। মূলনীতি কমিটির উর্দু রাষ্ট্রভাষা সুপারিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ ও সংগ্রাম কমিটি গঠন (নভেম্বর ১৯৫০) ভাষিক চেতনা নতুন করে জাগিয়ে তোলে। দেশজুড়ে শুরু হয় বিক্ষোভ সমাবেশ, মিছিল, প্রতিবাদ। পঞ্চাশ থেকে একান্নে পৌঁছে ভাষার দাবি ক্রমেই জোরালো হতে থাকে।

এবার অধিকসংখ্যায় শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, এমনকি সরকারি কর্মচারীদেরও অনেকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে এগিয়ে আসেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৫১) পূর্ববাংলায় সর্বস্তরের বাংলা প্রচলনের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের কাছে স্মারকলিপি পাঠানো হয়। এসব ক্ষেত্রে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ভাষার দাবি যে নতুন করে শক্তি অর্জন করছে, নানা ঘটনায় তা স্পষ্ট হতে থাকে।

একুশের পটভূমি তৈরিতে ১৯৫১

বছর তিনেকের জড়তা কাটিয়ে প্রতিপক্ষের আঘাত ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে ভাষার দাবিটি অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে পূর্ব ব্যর্থতার বোঝা ঝেড়ে ফেলতে থাকে। এদিক থেকে ১৯৫১ সালটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। স্বৈরশাসকদের চণ্ডনীতি বা অদূরদর্শিতা যে কখনো কখনো গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সুবাতাস বয়ে আনে, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে তা নানা ঘটনায় প্রমাণিত।

আটচল্লিশে পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তর একটি সাদামাটা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ভাষার দাবিতে আগুন জ্বেলেছিল। তেমনি আভাস ছিল পঞ্চাশে মূলনীতি কমিটির উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা সুপারিশের প্রতিক্রিয়ায়। আর বায়ান্নে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের রাষ্ট্রভাষাবিষয়ক মন্তব্যের স্ফুলিঙ্গ তো আন্দোলনের দাবানল তৈরি করে।

সবকিছু মিলিয়ে ১৯৫১ সন নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি, তেমনি স্বদেশে সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের দাবি নিয়ে তৎপরতার ক্ষেত্রে। ছাত্র-যুবসমাজে যেমন এ দাবির পক্ষে সমর্থন ব্যাপক হতে থাকে, তেমনি জনচেতনাকেও তা কিছুটা হলেও স্পর্শ করতে দেখা যায়। পায়ের নিচে মাটি শক্ত হয়ে ওঠার কারণেই বোধ হয় ১৯৫১ সালের ১১ মার্চ উদ্‌যাপন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এদিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে ইতিবাচক। এই প্রথম ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ১১ মার্চ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি চলে। সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে ওই দিন সব শিক্ষায়তনে ধর্মঘট পালিত হয়। সংগ্রাম কমিটির প্রচারিত এক ইশতেহারে বলা হয় : 'বন্ধুগণ, আসুন, আমরা ১১ মার্চ আমাদের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে স্মরণ করে পুনরায় লৌহদৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে ঘোষণা করতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করি।' নারায়ণগঞ্জসহ দেশের একাধিক শহরে সেবার ১১ মার্চ সভা, সমাবেশ, মিছিলসহ উদ্‌যাপিত হয়। আবার স্লোগান ওঠে, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।'

নতুন করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এমনই উদ্দীপনা জোগায় যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতো ধীরস্থির ব্যক্তিও ১৬ মার্চ (১৯৫১) কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত শিক্ষক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন : 'বাংলা ভাষা অবহেলিত হইলে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিদ্রোহ করিব।' এ সময় রাষ্ট্রভাষা বাংলার সমর্থনে এগিয়ে আসেন স্বনামখ্যাত বেশ কিছুসংখ্যক শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী। পরিবেশ তখন অনেকটাই বাংলার পক্ষে। চট্টগ্রামে এ সময় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতি এবং গণসংস্কৃতি ও প্রগতিবাদী সাংস্কৃতিক চেতনার যে প্রকাশ ঘটে, তা থেকেও সংস্কৃতি অঙ্গনে বাঁকফেরা পরিবর্তনের আভাস মেলে।

তাই দেখা যায়, রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সোচ্চার ছাত্রদের প্রতি জনসাধারণের মধ্য থেকেও সমর্থন উঠে আসতে শুরু করেছে। একান্নর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যদের কাছে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিসংবলিত স্মারকলিপি প্রেরণ (১১ এপ্রিল)। ওই স্মারকলিপি পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহলকে খুব একটা স্পর্শ না করলেও সাংবাদিক মহলে আলোড়ন তুলেছিল। *ডন* পত্রিকার পরোক্ষ সমর্থনের পাশাপাশি পেশোয়ারের *খাইবার মেইল* পত্রিকা সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখে : 'বাংলা ভাষার দাবি অবহেলা করা যায় না। আমরা মনে করি, বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাকেই পাকিস্তানের সরকারি ভাষারূপে স্বীকার করা উচিত' (২০ এপ্রিল)। একান্ন সালজুড়ে ভাষাবিষয়ক তৎপরতা ছিল লক্ষ করার মতো, যা একুশের বিস্ফোরক পটভূমি তৈরিতে সাহায্য করে।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে গড়ে ওঠা অনুকূল পটভূমি সত্ত্বেও বাংলাবিরোধীদের তৎপরতা তখনো বন্ধ হয়নি। সরকারি-বেসরকারি উভয় দিক থেকে তখনো চলেছে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা। গণপরিষদের কোনো কোনো বাঙালি সদস্য এদিক থেকে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। যেমন—করাচিতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান উর্দু সম্মেলনে (১৫ এপ্রিল ১৯৫১) সভাপতির ভাষণে মওলানা আকরম খাঁ উর্দু রাষ্ট্রভাষার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন।

এ বক্তব্যের প্রতিবাদে তৎকালীন *পাকিস্তান অবজারভার* বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৮ এপ্রিল এক প্রতিবাদী সম্পাদকীয়তে লেখা হয় : 'রিপোর্ট অনুযায়ী মওলানা আকরম খাঁ উর্দু সম্মেলনে বলেছেন যে, যারা উর্দুর বিরোধিতা করে তারা ইসলামের শত্রু। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তিনি এই শত্রুদের মধ্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতো ব্যক্তিদেরও অন্তর্ভুক্ত করেন।' এ বিষয়ে ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদের একাংশের প্রতিবাদ সূত্রে *অবজারভার* দুই দফায় প্রতিবাদী সম্পাদকীয় লিখে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুধু আকরম খাঁ নন, কবি গোলাম মোস্তফাসহ কয়েকজন লেখক, শিক্ষকও উর্দুর পক্ষে সমর্থন জানান। হতে পারে, বাংলা রাষ্ট্রভাষার পক্ষে ক্রমবর্ধমান সমর্থন তাঁদের শঙ্কিত করেছিল।

এভাবে ১৯৫১ সালে বাংলা রাষ্ট্রভাষার পক্ষে নতুন করে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলে যে তর্কবিতর্ক ও বাংলার পক্ষে যে তৎপরতা দেখা যায়, তা সেই মুহূর্তে ভাষা আন্দোলনের জন্ম দেয়নি ঠিকই, কিন্তু সন্দেহ নেই, তা ভবিষ্যৎ আন্দোলনের জন্য মজবুত ভিত তৈরি করেছিল। সেসব তৎপরতা ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিকে বাঙালি জীবনের এক তাৎপর্যময় সময় হিসেবে চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছে।

পটভূমি হিসেবে আরও নানা দিক থেকে সময়টা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্ববঙ্গে মানুষ তখন খাদ্যসংকট, লবণসংকট, পাটের মন্দাসহ নানা সমস্যায় জেরবার। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী আন্দোলন, ভুখামিছিল, অর্থনৈতিক মন্দা এবং সেই সঙ্গে সরকারি দমননীতি, নির্যাতন—সবকিছু মিলেই একুশের পটভূমি তৈরি করে। দেশব্যাপী অসন্তোষের প্রেক্ষাপটে আগুন জ্বালতে দরকার ছিল একটি স্ফুলিঙ্গের। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সে স্ফুলিঙ্গটির জোগান দিয়েছিলেন বায়ান্ন সালের ২৭ জানুয়ারি তাঁর ভাষণে।

একুশে ফেব্রুয়ারি কীভাবে এল

পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক পরিবেশে তখন এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছে। এর কারণ যেমন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি নিয়ে ছাত্র-যুবসমাজে শাসকবিরোধী মনোভাবের বিস্তার, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা-সংকট, যা সমাজের প্রায় সব শ্রেণীকেই কমবেশি স্পর্শ করেছে। এমন এক পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকা সফরে আসেন। ২৭ জানুয়ারি (১৯৫২) পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'পাকিস্তানকে আমরা এছলামী রাষ্ট্ররূপে গঠন করিতে যাইতেছি।...প্রাদেশিক ভাষা কি হইবে তাহা প্রদেশবাসীই ঠিক করিবেন, কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে উর্দু' (দৈনিক *আজাদ*, ২৮ জানুয়ারি ১৯৫২)।

উর্দুভাষী খাজা সাহেবের কাছে হয়তো তাঁর কথা অযৌক্তিক বলে মনে হয়নি। কারণ, মুসলিম লীগের রাজনীতিকদের বিচারে পাকিস্তান ইসলামি রাষ্ট্র; সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর যোগ্যতাই তো সবচেয়ে বেশি। কিন্তু পূর্ববঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন পূর্ব-অভিজ্ঞতা স্মরণ থাকলে হয়তো তিনি এমন মন্তব্য করার আগে তিনবার ভাবতেন। উর্দুর পক্ষে মূলনীতি কমিটির সুপারিশ স্থগিত করার কথাও ভাবতেন। কিন্তু এসব বিষয় আমলে আনেননি প্রধানমন্ত্রী।

মৌচাকে ঢিল ছোড়ার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে ৩ ফেব্রুয়ারি সম্ভবত কারও পরামর্শে সংবাদ সম্মেলন ডেকে তিনি বিষয়টি হালকা করতে চেষ্টা করেন; অবশ্য মূল বক্তব্য থেকে সরে না এসে। জিন্নাহ সাহেবের ঢাকা সফরকালীন বক্তৃতা উল্লেখ করে খাজা সাহেব বলেন যে তিনি 'কায়েদে আযমের মতামত উল্লেখ করেছেন মাত্র। কারণ, তিনি কায়েদের নীতিতে দৃঢ়বিশ্বাসী। তবে এ বিষয়ে গণপরিষদই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।' একই সঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন যে এ বিষয়ে যারা জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চাইবে, তারাই পাকিস্তানের দুশমন। ঠিক এ ধরনের কথা ঢাকায় বসে জিন্নাহ সাহেবও বলেছিলেন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জানতেন না যে আটচল্লিশ সাল আর বায়ান্ন সাল পরিস্থিতি বিচারে এক নয়। চার বছরে বুড়িগঙ্গা দিয়ে অনেক পানি বয়ে গেছে।

তাদের অপশাসন পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে রাজনীতিনিরপেক্ষ সাধারণ ছাত্ররাও তখন ভাষার দাবি নিয়ে অনেক বেশি সচেতন। বাংলা রাষ্ট্রভাষা তাদেরও দাবির অন্তর্ভুক্ত। আর সে জন্যই খাজা সাহেব বুঝতে পারেননি যে তাঁর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় পরদিন থেকেই অঘটনের পাথর গড়াতে শুরু করবে।

ওই পাথর গড়ানোর প্রক্রিয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সভার অনুষ্ঠান, ৩০ জানুয়ারি সব শিক্ষায়তনে ধর্মঘট এবং ছাত্র এলাকায় স্লোগানমুখর মিছিল—'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' উচ্চারণ বাতাসে উত্তাপ ছড়াতে থাকে। ওখানেই শেষ নয়। ৩১ জানুয়ারি (১৯৫২) ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনে সরকারবিরোধী সব দল ও সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। মূল উদ্দেশ্য পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করা। ৪০ সদস্যের ওই পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন কাজী গোলাম মাহবুব।

সংগ্রাম পরিষদের তৎপরতার অপেক্ষায় না থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটি, যুবলীগ এবং বিভিন্ন কলেজ ইউনিয়নের মতো একাধিক ছাত্র সংগঠন কাজে নেমে পড়ে। আর তাতে অভাবিত সাড়াও মেলে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৪ ফেব্রুয়ারির ছাত্রসভায় ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল দেশব্যাপী হরতাল, সভা, শোভাযাত্রা এবং ঢাকায় অ্যাসেম্বলি (আইন পরিষদ) ঘেরাও। উদ্দেশ্য আইন পরিষদের প্রথম দিনের অধিবেশনেই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের জন্য প্রস্তাব পাস করানো। এই ছিল অ্যাসেম্বলি ঘেরাওয়ের তাৎপর্য।

৪ ফেব্রুয়ারি সভা শেষে ১০-১২ হাজার ছাত্রছাত্রীর বিশাল মিছিল রাজপথ ঘুরে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের বাসভবন বর্ধমান হাউসের সামনে জড়ো হয়ে স্লোগান তোলে : 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'আরবি হরফে বাংলা লেখা চলবে না', 'ভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্র চলবে না'। লক্ষ করার বিষয় যে ছাত্রদের এ মিছিলে বেশ কিছুসংখ্যক সরকারি কর্মচারী ও সাধারণ শ্রেণীর মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়। ছাত্রসভার এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করে এই দিনই সর্বদলীয় পরিষদের সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং মওলানা ভাসানী ওই কর্মসূচি সফল করে তোলার জন্য দেশব্যাপী ছাত্র-জনতার প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার বিরুদ্ধে বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট ও বিক্ষোভ সভার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবি বায়ান্ন সালে পৌঁছে এতটা ব্যাপক হয়ে উঠেছিল যে ঢাকার জন্য নির্ধারিত কর্মসূচি ঢাকার বাইরে একাধিক শহরে অধিকতর উৎসাহ-উদ্দীপনায় পালিত হয় (সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক*, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে

আন্দোলনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত। দরকার সরকারের পক্ষ থেকে আরেকটি অদূরদর্শী পদক্ষেপ। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন ও তাঁর অবাঙালি-প্রধান প্রশাসন তখনকার পরিস্থিতি একেবারেই বুঝতে পারেনি। বাংলা ভাষার দাবি কতটা ব্যাপক, কতটা ছাত্র-জনতার মন স্পর্শ করেছে, তা তাদের জানা ছিল না।

একুশে ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি সফল করার জন্য ঢাকায় বিভিন্ন ছাত্রাবাস ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মতৎপরতা শুরু হওয়ার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন শহরের ছাত্রনেতাদের সঙ্গে যোগাযোগেরও চেষ্টা চলে। উদ্দেশ্য একটাই : বাংলা রাষ্ট্রভাষার অধিকার আদায়। এ কাজে যুবলীগ, ছাত্রাবাসগুলোর নেতা-কর্মী এবং বামপন্থী ছাত্র-যুবনেতারা মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। সঙ্গে ছিল রাজনীতি-সচেতন ছাত্রসমাজ। এদের চেষ্টায় একুশে ফেব্রুয়ারি জাতীয় জীবনের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যময় দিন হিসেবে উঠে আসতে পেরেছিল।

বিস্ফোরক দিনটির জন্য দেশজুড়ে প্রস্তুতি

হাতে মাত্র দুই সপ্তাহের মতো সময়। দেশজুড়ে দিনটি যথাযথভাবে পালন অর্থাৎ এর কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সময় ছিল না। কারণ, এত অল্প সময়ে এত বড় কাজের জন্য সাংগঠনিক শক্তির যথেষ্ট অভাব ছিল। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এমন শক্তি ছিল না সে অভাব মেটায়। ভাষার মতো একটি সর্বজনীন বিষয়কে দলমত-নির্বিশেষে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে এবং জনমনে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। কিন্তু ওই পরিষদ তাদের দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি সফল হয়নি। কারণ, এখানেও ছিল আগেকার মতোই মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব ও মতামতের ভিন্নতা। আর সে দ্বন্দ্ব ও ভিন্নতার টানাপোড়েন যে আন্দোলনে নেতিবাচক প্রভাব রেখেছিল. পরবর্তী ঘটনাবলি থেকে তা বুঝতে পারা যাবে।

মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় পরিষদের বৈঠকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমন—আন্দোলনের প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহের জন্য ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পতাকা দিবস পালন। তবে সবচেয়ে জরুরি আলোচ্য বিষয় ছিল সম্ভাব্য ১৪৪ ধারা জারির পরিপ্রেক্ষিতে কর্মসূচি নির্ধারণ। অলি আহাদের মতে, সেদিন বৈঠকে উপস্থিত অধিকাংশ সদস্য আইন অমান্য করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু অলি আহাদ ও বৈঠকের সভাপতি মওলানা ভাসানী অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার পক্ষে জোরেশোরে কথা বলেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক শেষ হয়।

এ সময়কার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঢাকার বাইরে বিভিন্ন শহরে একুশের কর্মসূচি সফল করে তোলার উদ্দেশ্যে সভা, সমাবেশ, বক্তৃতা, ইশতেহার বিলি ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্লোগানসহ মিছিলের আয়োজন। উদ্দেশ্য ছাত্র ও জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রভাষাবিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি। আরেকটি লক্ষণীয় দিক হলো, এই প্রথম ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরা অধিক সংখ্যায় সভা-সমাবেশে যোগ দেয়, বক্তৃতা করে এবং মিছিলে অংশ নেয়। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষজনকেও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অংশ নিতে দেখা যায়; তবে তা ব্যাপকভাবে নয়, সর্বত্র নয়।

ভাষা আন্দোলনের সংগঠকেরা সংগত কারণে বন্দীমুক্তির বিষয়টি তাদের সাংগঠনিক প্রচারের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেন। যে জন্য 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানের পরই উচ্চারিত হতো 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই'। কারণ, মুসলিম লীগের অসহিষ্ণু অনাচারী শাসনে রাষ্ট্রদ্রোহের মিথ্যা অজুহাতে শুধু কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীরাই গ্রেপ্তার হননি, সরকারের সমালোচনার দায়ে অনেক বিরোধীদলীয় বা গণতান্ত্রিক সংগঠনের নেতা-কর্মীও গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘদিন ধরে বন্দী জীবন যাপন করছিলেন। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদের মতো নেতাও কারাগারে আটক।

তাই ১৯ ফেব্রুয়ারি বন্দীমুক্তির দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্রসভা আহ্বান করা হয়। এতে বক্তৃতা করেন জিল্লুর রহমান, নাদেরা বেগম ও শামসুল হক চৌধুরী। সভায় শেখ মুজিবুর রহমান, মহিউদ্দিন আহমদসহ সব রাজবন্দীর মুক্তি দাবি করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলন কমিটি নামের একটি কমিটিও গঠন করা হয় (বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪১)। বায়ান্নর শেষ দিকে বন্দীমুক্তি কমিটি আরও গুরুত্ব অর্জন করে। জোরদার হয় সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল। সরকার বাধ্য হয় তেপ্পান্ন থেকে রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে, তবে ধীরেসুস্থে।

পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ সাংগঠনিক কমিটি ভাষাসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এ সময় কয়েকটি ইশতেহার সার্কুলার প্রকাশ করে, তবে তা তাদের কর্মী, সদস্য ও সমর্থকদের জন্য। ১১ ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন' শিরোনামের এমন একটি সার্কুলারে নাজিমুদ্দিনের বক্তৃতা এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি ও ছাত্রদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা শেষে লেখা হয়, '১৯৪৮ সালের আন্দোলন হইতেও এবারের আন্দোলন অনেক বেশি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।...এই সময়ে রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালিত হইলে পূর্ববঙ্গের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং বাঙ্গালী ও অন্যান্য জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া আগাইয়া যাইবে।'

সার্কুলারে রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে আরও বলা হয়, 'বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা কর—এই দাবী বাঙ্গালী জাতির জাতীয় অধিকারের দাবি, এই দাবী বাঙ্গালী জাতির জন্মগত অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবী। অতএব রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন বাঙ্গালী জাতির অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। কিন্তু রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কেবল বাঙ্গালী জাতিরই আন্দোলন নয়, রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষি জাতি, যেমন—বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পাঠান, বেলুচ ইত্যাদি সকল জাতির ভাষা ও কৃষ্টিকে সমমর্যাদা দেওয়ার আন্দোলন' ('ভাষা আন্দোলনের দলিল সংকলন', বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি)।

সবশেষে সদস্য, কর্মী ও সমর্থকদের করণীয় সম্পর্কে সার্কুলারে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সঠিক পথে পরিচালনার জন্য বিশেষ কয়েকটি স্লোগান বাধ্যতামূলকভাবে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে, 'পাকিস্তানের সকল ভাষার

সমমর্যাদা চাই', 'পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতির নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষা লাভ করা ও রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার চাই' এবং 'বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা চাই'।

এসব সার্কুলার প্রকাশ্যে বিতরণ করা হয়নি এবং সরাসরি জনসাধারণের গোচরে আসেনি সত্য, কিন্তু প্রচারিত বক্তব্য বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মূল কারিগরদের অধিকাংশের, অর্থাৎ পার্টি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চেতনায় উপস্থিত ছিল।

তাঁরাই ছিলেন বায়ান্নর আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ও নেতৃস্থানীয় কর্মীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভাষা আন্দোলনবিষয়ক এ-জাতীয় কয়েকটি সার্কুলার লেখকের সংগ্রহেও রয়েছে। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতিসত্তা অধ্যুষিত প্রাদেশিক ভাষাগুলোকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের সুপারিশ কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকেই প্রথম করা হয়। তবে উর্দুর ভাষিক বাস্তবতার কারণে এবং পশ্চিম পাকিস্তানবাসী মানুষ অনেকেই কমবেশি উর্দু জবানে অভ্যস্ত বলেই কমিউনিস্ট পার্টি উর্দুর দাবি নাকচ করেনি, যদিও উর্দু পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো প্রদেশের জাতিসত্তার ভাষা নয়। উর্দু প্রকৃতপক্ষে দেশ বিভাগের কারণে ভারত থেকে পাকিস্তানে আসা মোহাজেরদের ভাষা। তাদের অধিকাংশ বিহার, উত্তর প্রদেশ, হায়দরাবাদ, দিল্লি ইত্যাদি অঞ্চল থেকে পাকিস্তানে আসে এবং পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রধান অংশ হয়ে ওঠে।

কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য এ ক্ষেত্রে তুলে ধরার কারণ পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাষা আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা ওই মূল বক্তব্য মাথায় রেখে আন্দোলন পরিচালনা করেছেন এবং তাতে অংশ নিয়েছেন। সে জন্যই বাংলার দাবি এসেছে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে এবং উর্দুর বিরোধিতা না করে। এসব নেতা-কর্মীর মাধ্যমেই কমিউনিস্ট পার্টির ভাষাবিষয়ক মূল বক্তব্য ছাত্র-জনতার কাছে পৌঁছেছে। এদের লক্ষ্য ছিল যথাসম্ভব শান্তিপূর্ণভাবে ভাষা আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনে পরিণত করা এবং তাতে জনস্বার্থের কর্মসূচি যুক্ত করা। কিন্তু সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদে নানা মতের কারণে সুনির্দিষ্ট জনস্বার্থমূলক কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। আবদুল মতিনের মতে, তাঁর এ ধরনের প্রস্তাব বারবার বাধার সম্মুখীন হয়েছে। এবং এ কথাও ঠিক যে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্লোগান নিয়ে আন্দোলন দীর্ঘসময় সচল রাখা সম্ভব ছিল না।

একুশের ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্বে দেশজুড়ে নানা মতের মানুষ ভাষার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বড় একটি বিষয় ছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা নানা কর্মতৎপরতার মাধ্যমে স্থানীয় ছাত্র-যুবা ও জনসাধারণকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি আদায়ের আন্দোলনে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। প্রধানত সভা-সমাবেশ, হরতাল-মিছিলের মাধ্যমে প্রস্তুতিপর্বের কর্মতৎপরতা প্রকাশ পেয়েছে। শুধু জেলা শহরই নয়, মহকুমা শহর ছাড়াও ছোটখাটো শহরেও স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে একুশের প্রস্তুতিপর্বের কাজ চলেছে। এতে কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রভাব ছিল সামান্যই। ভাষার অধিকার অর্জনের আবেগই ছিল আন্দোলন শুরুর মূল চালিকাশক্তি। সে ক্ষেত্রে সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের ভূমিকা ছিল গৌণ।

যে বাধা না ভাঙলে একুশে কখনো একুশে হতো না

একুশে ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) পূর্ববঙ্গ আইনসভার প্রথম বাজেট অধিবেশন শুরু। সে কথা মাথায় রেখেই একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফেব্রুয়ারির ৪ তারিখ থেকে পরবর্তী দুই সপ্তাহে সংঘটিত তৎপরতার চরিত্র লক্ষ করে অবাঙালিপ্রধান প্রশাসক কর্তৃপক্ষ হয়তো কিছুটা ভীত হয়েছিল অথবা ভাষার দাবিতে বাঙালি ছাত্রদের সাহস ও কর্মকাণ্ড তাদের অহংবোধে আঘাত করেছিল। তাই একুশের সাদামাটা কর্মসূচি নস্যাৎ করে দিতে তারা ২০ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এক মাসের জন্য ঢাকায় সভা-সমাবেশ, মিছিল-বিক্ষোভ—সবকিছু নিষিদ্ধ করা হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ছাত্র এলাকায় মাইকে ওই ঘোষণা ছাত্র-জনতা সবাইকে অবাক করে দেয়।

ছাত্র-বুদ্ধিজীবী-রাজনীতিকদের মধ্যে ওই নিষেধাজ্ঞার প্রতিক্রিয়া ছিল বিভিন্ন রকম। সামনে সাধারণ নির্বাচনের সম্ভাবনা মাথায় রেখে রাজনৈতিক নেতাদের অধিকাংশই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নির্ধারিত কর্মসূচি পালনের পক্ষপাতী ছিলেন না। মওলানা ভাসানী পূর্বনির্ধারিত কর্মকাণ্ডের টানে ঢাকায় অনুপস্থিত থাকায় সেদিন তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিস এবং বিশেষ একটি ছাত্রাবাস ইউনিয়নের প্রতিনিধি ১৪৪ ধারা ভাঙা হঠকারী পদক্ষেপ বলে মনে করেন। আর আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনৈতিক সমর্থক স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান ছিল অনেকটাই নিরক্ষরেখায়। এ নিয়ে ভিন্ন মতও রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই।

কিন্তু রাজনীতি-সচেতন সাধারণ ছাত্রদের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁরা ছিলেন যেকোনো মূল্যে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কর্মসূচি পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একই মনোভাব ছিল যুবলীগ এবং ছাত্রনেতৃত্বের বাম অংশের। অধিকাংশ ছাত্রাবাস ইউনিয়নের নেতা অনুরূপ মনোভাব পোষণ করেছেন; যেমন ফজলুল হক হল, ঢাকা হল, মেডিকেল কলেজ, জগন্নাথ কলেজের ছাত্রসংগঠন। সেদিন সন্ধ্যায় হল-হোস্টেলের ছাত্রদের উত্তেজিত প্রতিক্রিয়া যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই জানেন, কতটা

সাহসে ভর করে ওই সব ছাত্র ভাষার জন্য লড়াইয়ে নামতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রয়োজনে জান বাজি। বাস্তবে তেমনটাই ঘটেছে।

রাজনীতিকেরা তো বরাবরই সুবিধার পথ ধরে হাঁটেন। জাতীয় স্বার্থ থেকে সেখানে রাজনৈতিক স্বার্থ তথা ব্যক্তিস্বার্থ প্রবল। ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত তা-ই প্রমাণ করে। মওলানা ভাসানীর অনুপস্থিতির কারণে জনাব আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংগ্রাম পরিষদের সভায় সব রাজনৈতিক নেতা এবং অধিকাংশ ছাত্রনেতা ১৪৪ ধারা অমান্য করে সরকারের সঙ্গে সংঘাতে যেতে রাজি হননি। স্বয়ং সভাপতিও তাঁদের সমর্থন করে বক্তব্য দেন। পূর্বোক্ত কর্মিসভায় সম্ভাব্য ১৪৪ ধারা সম্পর্কে ভাসানীর বক্তব্য বিচারে মনে হয়, সংগ্রাম পরিষদের এ বৈঠকে ভাসানী উপস্থিত থাকলে সিদ্ধান্ত ভিন্নতর হতো।

সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তে আপত্তি জানান যুবলীগের নেতা অলি আহাদ, বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক আবদুল মতিন এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ ইউনিয়নের ভিপি গোলাম মাওলা। ১১-৩ ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়ী হলেও ভিন্ন মতের গুরুত্ব উপেক্ষা করতে পারেননি বৈঠকের সভাপতি। তাই অলিখিত সিদ্ধান্ত, পরদিন অর্থাৎ একুশে ফেব্রুয়ারি সকালে আমতলায় উপস্থিত ছাত্রদের মতামতই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। তবে সভাপতি সেই সঙ্গে একটা শর্ত জুড়ে দেন এই বলে যে যদি ছাত্রসভার মতামত সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে যায়, তাহলে এই পরিষদ বিলুপ্ত গণ্য হবে। আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে এ শর্তের কথা সংশ্লিষ্ট অনেকেই মনে রাখেননি; যেমন রাখেননি বক্তা নিজেও। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন : সাধারণ ছাত্রকর্মীদের সম্মেলনে গঠিত সংগ্রাম পরিষদ কি কোনো বৈঠকের সভাপতি বিলুপ্ত ঘোষণা করতে পারেন?

সে রাতে হল-হোস্টেলগুলোতে ছাত্রদের চোখে ঘুম ছিল না। গভীর রাত পর্যন্ত তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ অন্যান্য ছাত্রাবাসের ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, যাতে তাঁরা একুশের সকালে আমতলার সভায় হাজির হন। এসব আলোচনার মূল কথা ছিল একটাই, ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্তে নিশ্চিত থেকে নির্ধারিত কর্মসূচি পালন। সর্বোপরি অ্যাসেম্বলি ঘেরাও করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রস্তাব নিতে এমএলএদের বাধ্য করা।

পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের আমতলায় অনুষ্ঠিতব্য ছাত্রসভায় সরকার আরোপিত ১৪৪ ধারা অমান্য করার গুরুত্ব রাজনীতি-সচেতন ছাত্ররা ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা জানতেন, ওই বাধার শিকল ভাঙতে না পারলে ভাষার দাবি ও আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়বে। কিন্তু এ সহজ সত্যটা কেন জানি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সর্বোচ্চ নেতারা বুঝতে পারেননি, অথবা বুঝতে চাননি। তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক প্রয়োজনের গুরুত্বই বড় করে দেখেছেন।

আরও একটি বিষয় জেনে রাখা দরকার যে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ নামে সর্বদলীয় হলেও তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনগুলোর। তাদের মতামতে সমর্থন জানিয়েছেন কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক নেতা, যাঁরা সাংবিধানিক রাজনীতির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন অনেক বেশি। তাঁদের পথ ধরে সচেতন ছাত্রসমাজ চলতে চায়নি বলেই 'একুশে'কে ঐতিহাসিক 'একুশে'তে পরিণত করা সম্ভব হয়েছিল।

আমতলা থেকে মেডিকেল ব্যারাকে

একুশে ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) সকালটা ছাত্রদের জন্য ছিল টান টান উত্তেজনায় অস্থির। রাতভর উত্তেজনার উত্তাপ ঠান্ডা সকালেও শেষ হয়নি। ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহেও শীতটা সে বছর বেশ জেঁকে বসেছিল। রোদ উঠতে না উঠতে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের আনাগোনায় ছাত্র এলাকা সরব হয়ে ওঠে। যেমন মেডিকেল কলেজ ব্যারাক, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। অর্থাৎ তখনকার আর্টস বিল্ডিং, এখন যা মেডিকেল কলেজ ইমার্জেন্সি।

গেটের কাছাকাছি গোলগাল বড়সড় আমগাছ, তার উত্তর-পশ্চিম দিকে মধুর ক্যান্টিন। পূর্ব দিকে বেলতলায় ছোট্ট পুকুর—বড় ডোবা বললেও চলে। দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গভঙ্গ আমলের দালান—আর্টস বিল্ডিং, লাগোয়া পাঁচিল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। সর্বদক্ষিণে রেললাইন। এ ভূগোলেই সেদিন ছাত্রদের উত্তেজিত পদচারণে আমতলার ছাত্রসভা ঐতিহাসিক চরিত্র অর্জন করেছিল।

সকাল থেকেই স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আগ্রহী ছাত্রদের উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ উত্তাপ ছড়াচ্ছিল। আলোচনা, তর্কবিতর্ক সবকিছুই ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা নিয়ে। সেই সঙ্গে চলেছে মধুর ক্যান্টিনে চা-পান। এর মধ্যেই গেটের বাইরে রাস্তায় খাকি হাফপ্যান্ট পরা পুলিশ বাহিনীর সতর্ক অবস্থান। তাদের কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে অস্ত্র। পাশে দাঁড়ানো জিপগাড়ি ও ট্রাক। অর্থাৎ তারা প্রস্তুত। প্রস্তুত যেকোনো ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য।

যত দূর মনে পড়ে, আমতলার ছাত্রসভা শুরু হয় বেলা প্রায় ১১টার দিকে। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজনীতিক শামসুল হক সাহেব আসেন তাঁদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বক্তব্য দিতে। তাঁর পরনে কালো শেরওয়ানি, মাথায় জিন্নাহ টুপি। ক্যান্টিনের পাশে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর অনানুষ্ঠানিক আলাপ। পাশে দাঁড়ানো কাজী গোলাম মাহবুব, খালেক নেওয়াজ খান, হেদায়েত হোসেন চৌধুরী প্রমুখ ছাত্রনেতা তাঁর আপস ফর্মুলার প্রতি সমর্থন জানাচ্ছিলেন।

সভার শুরুতে প্রথম বক্তা শামসুল হক। ১৪৪ ধারা অমান্য না করার রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থিত ছাত্রদের উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদে মাঝপথে থেমে যায়। তাঁর বক্তব্য সেদিন গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেনি। এরপর ছাত্র-যুবনেতাদের দু-একজনের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির আহ্বায়ক আবদুল মতিনের মূল প্রস্তাব: 'এ মুহূর্তে ১৪৪ ধারা ভেঙে নির্ধারিত কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে না গেলে আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়বে, ভাষার দাবি কোনো দিনই অর্জিত হবে না।' উপস্থিত ছাত্রদের সমর্থনে এমন সিদ্ধান্তই বহাল থাকে। ঠিক হয়, ১০ জনের ছোট ছোট মিছিল নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় বেরিয়ে যাবে। লক্ষ্য অ্যাসেম্বলি হল। আপাত গন্তব্য কাছাকাছি অবস্থিত মেডিকেল ব্যারাক প্রাঙ্গণ। সভায় আবদুস সামাদসহ দু-একজন ছাত্রনেতা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন।

সভাপতি গাজীউল হকের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় উল্লিখিত সিদ্ধান্ত ঘোষণার মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়। কিছুক্ষণ ধরে বিরতিহীন স্লোগান ওঠে: 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই', 'পুলিশি জুলুম চলবে না', 'চলো, চলো, অ্যাসেম্বলি চলো' ইত্যাদি। সভা শেষ হতে না হতে কিছুটা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে যখন ১০ জন করে ছাত্রছাত্রীর মিছিল গেট দিয়ে বের হতে চেষ্টা করছে, পুলিশি জুলুম তখন আরও জোরেশোরে শুরু হয়ে যায়।

জুলুম গোটা প্রাঙ্গণে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়া, রাস্তায় ছাত্রছাত্রীদের ওপর লাঠিচার্জ এবং বেশ কিছু ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে পিকআপ ভ্যানে তোলার জবরদস্তিতে প্রকাশ পেয়েছিল। তবে কাঁদানে গ্যাসের আক্রমণ এতটাই প্রবল ছিল যে আমতলাসংলগ্ন এলাকা ধুলো ও ধোঁয়ায় একাকার হয়ে যায়। গ্যাসের জ্বালায় ছাত্রদের অনেকে বেলতলার পুকুরে রুমাল ভিজিয়ে চোখে চেপে ধরতে থাকে। অনেকে পেছনের রেললাইন ধরে, কেউ ভাঙা পাঁচিল ডিঙিয়ে ব্যারাক প্রাঙ্গণের দিকে ছুটে যেতে থাকে।

রাস্তায় পুলিশের লাঠি হামলায় আক্রান্ত ছাত্রদের কেউ কেউ কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় খেলার মাঠে ঢুকে পড়ে। তবে অধিকাংশই লাঠি-তাড়নার মধ্য দিয়েই দ্রুত এগিয়ে চলে হাসপাতাল ও ব্যারাক প্রাঙ্গণের দিকে। সেদিন পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে যাঁরা ট্রাকে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের পরিচিত মুখ এখনো মনে পড়ে; যেমন—আবদুস সামাদ, হাবীবুর রহমান শেলী, আলী আজমল, আনোয়ারুল হক খান প্রমুখ ছাত্রনেতা।

সেদিন আর্টস বিল্ডিং প্রাঙ্গণে নেতৃস্থানীয় যেসব ছাত্রী আমতলার সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শাফিয়া খাতুন, রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া ইব্রাহিম, শামসুন্নাহার প্রমুখ। তাঁরা পুলিশের বাধা এড়িয়ে মেডিকেল হোস্টেলের দিকে যান। তাঁদের মধ্যে রওশন আরা পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হন। তবে তাঁদের কাউকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি।

পুলিশের ওপর ইটপাটকেল ছোড়ার অভিযোগ যেমন সত্য, তেমনি এ তথ্যও সঠিক যে পুলিশও ছাত্রদের ওপর পাল্টা ইটপাটকেল ছুড়েছে। আর বেপরোয়া লাঠিচার্জের পাশাপাশি একটু পরপরই কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়েছে এবং তা এতই যে ছাত্রদের পক্ষে আমতলা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

শেষ পর্যন্ত পুলিশের বেপরোয়া আক্রমণ থেকে মাথা বাঁচিয়ে ছাত্রদের ব্যারাক প্রাঙ্গণে আশ্রয় নিতে দেখা যায়। তখন বেলা দুপুর। আমতলা থেকে ব্যারাক প্রাঙ্গণে পৌঁছে ছাত্রদের লক্ষ্য হয়ে ওঠে অ্যাসেম্বলি ভবন ঘেরাও এবং রাস্তা থেকে যথাসম্ভব এমএলএ কাউকে না কাউকে আটক করে বাংলা রাষ্ট্রভাষার পক্ষে প্রস্তাব তোলার প্রতিশ্রুতি আদায়। আইনসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা বিকেল তিনটায়।

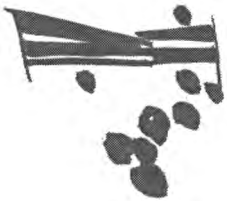

পুলিশের গুলি ও ইতিহাসের ট্র্যাজেডি

একটা সাধারণ সত্য সবাই জানি, যেকোনো আন্দোলন বা আদর্শগত লড়াই একবার শুরু হয়ে গেলে যোদ্ধাদের মনে আর ভয়ভীতি, দ্বিধা-সংশয় থাকে না। যেকোনো মূল্যে গন্তব্যে পৌঁছানো তখন একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। একুশে ফেব্রুয়ারি সকালে আমতলার সভা শেষে সরকারি বাধানিষেধ ভেঙে বেরিয়ে আসার পর ছাত্রছাত্রীদের মনে পেছন ফিরে তাকানোর মতো চিন্তা ঠাঁই পায়নি। তখন তাদের একমাত্র লক্ষ্য লড়াইয়ে জেতা, যা ছিল নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ লড়াই।

আর সে উদ্দেশ্য নিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি দুপুর থেকে ছাত্রদের ব্যারাক প্রাঙ্গণে উপস্থিতি। বেলা গড়াতে শুরু করলে অছাত্র অনেককেই জমায়েত হতে দেখা যায়। যেমন—সচিবালয়ের তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, দোকান-রেস্তোরাঁর কর্মী এবং পথচারী মানুষজন। রাষ্ট্রভাষার দাবি তখন আর ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। দাবি আদায়ের লড়াইটা হয়ে ওঠে ছাত্র-জনতা সবারই, ২২ ফেব্রুয়ারির গণ-আন্দোলনে যা পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

আইনসভার অধিবেশনে যোগ দিতে অনেক সদস্যই ব্যারাকের সামনের রাস্তা দিয়ে যাবেন, ছাত্রদের এমন ধারণা ভুল ছিল না। মেডিকেল কলেজের কয়েকজন ছাত্র তাই সহজেই মানিকগঞ্জের এমএলএ আওলাদ হোসেনকে হোস্টেলে নিয়ে আসে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রস্তাব তোলার শর্তে তিনি মুক্তি পান। ছাত্ররা মন্ত্রী হাসান আলীর গাড়িও আটক করে, কিন্তু পুলিশ তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। বিরোধীদলীয় সদস্য নেলী সেনগুপ্তা ছাত্রদের দাবি উপেক্ষা করে দ্রুত চলে যান।

এসব ঘটনার মধ্যেই সমবেত ছাত্র-জনতার চেষ্টা চলে হোস্টেল-সংলগ্ন পরিষদ ভবনের সামনের রাস্তায় পৌঁছানোর। কিন্তু লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসের আক্রমণে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। পুলিশের কঠিন বাধার মুখে ছাত্রদের একমাত্র পুঁজি বহু উচ্চারিত স্লোগান—'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'পুলিশি জুলুম চলবে না' ইত্যাদি

এবং মেডিকেল ব্যারাকের কন্ট্রোল রুম থেকে আন্দোলনের পক্ষে প্রচার—প্রচার পরিষদ সদস্যদের উদ্দেশে—প্রচার পথচারী মানুষকে আন্দোলনে টেনে আনতে। আন্দোলনের প্রচারকাজে সাহায্য করতে একুশে ফেব্রুয়ারি দুপুরে মেডিকেল কলেজ ইউনিয়নের উদ্যোগে ২০ নম্বর শেডের ১ নম্বর কক্ষে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়। প্রচারকাজে ব্যবহার করা হয় কলেজ ইউনিয়নের নিজস্ব মাইক-স্পিকার। প্রচারের সার্বক্ষণিক দায়িত্বে থাকেন মেডিকেলের কয়েকজন ছাত্র। মাত্র দুই দিনের আয়ু নিয়ে এই কন্ট্রোল রুম আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি হয়ে উঠেছিল। গুলিতে ছাত্র-অছাত্র হত্যার খবর এখানকার প্রচারের কল্যাণেই মুখে মুখে গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল, এমনকি পৌঁছেছিল পরিষদ ভবনে।

ছাত্রদের এ রকম তৎপরতা যদি লড়াই হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয়, নিরস্ত্র ছাত্র-জনতা বনাম সশস্ত্র পুলিশের ওই লড়াই তখন ঘণ্টা দুই-তিন স্থায়ী হয়েছিল। ছাত্র-জনতার অবস্থান তখন হোস্টেল প্রাঙ্গণে, কলেজ গেটের সামনে, খেলার মাঠসংলগ্ন রাস্তার তেমাথায়। ফুলার রোডে দাঁড়ানো হোটেল-রেস্তোরাঁ 'মেকো', 'পপুলার', 'নাজমা'র বয়-বেয়ারা থেকে হাসপাতালের ওয়ার্ডবয় এবং আশপাশের সাধারণ মানুষের উপস্থিতি প্রতিবাদী জনতার আয়তন বাড়িয়ে তোলে। তাদের মুখেও ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে ও পুলিশি জুলুমের বিরুদ্ধে স্লোগান।

এ অবস্থায় পরিস্থিতি বিচার করে নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষদর্শীও স্বীকার করবেন যে ছাত্রদের কার্যক্রম বা তৎপরতা পুলিশের নিরাপত্তায় কোনো হুমকি সৃষ্টি করেনি। এককথায়, গুলি চালানোর মতো কোনো পরিস্থিতি তখন দেখা দেয়নি। তাই এতকাল পরও আজ ভাবতে অবাক লাগে যে নিরস্ত্র ছাত্রদের রাস্তায় বেরিয়ে আসা ঠেকাতে কেন পুলিশ গুলি ছুড়েছিল! ছাত্ররা তো সামনের রাস্তায় পুলিশের ব্যারিকেডও অতিক্রম করতে পারেনি। তাই সেদিনের প্রশ্ন আজও আমাদের ভাবায় : পুলিশের ওই চরম ব্যবস্থা গ্রহণের আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিল কি না।

হোস্টেল প্রাঙ্গণে সমবেত ছাত্রদের কেউ ভাবতে পারেনি, বিরাজমান পরিস্থিতিতে পুলিশ গুলি চালাতে পারে। সে জন্যই টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটার আওয়াজ শুনতে শুনতে গুলির আওয়াজে জনা কয়েক ছাত্র চেঁচিয়ে ওঠে, 'ফাঁকা আওয়াজ, ফাঁকা আওয়াজ।' কিন্তু ওগুলো যে ফাঁকা আওয়াজ নয়, তা বোঝা গেল কয়েকজনকে গুলির আঘাতে পড়ে যেতে দেখে। বিশেষ করে, ১৪ নম্বর ব্যারাকের সামনে মাথায় গুলি লাগা ছাত্রটিকে দেখে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, গুলি চলে বিকেল তিনটা ২০ মিনিটে, গুলি ২৭ রাউন্ড। তখন পরিষদ ভবনে আইনসভার অধিবেশন শুরু হয়েছে।

পুলিশ বাহিনী শুধু হোস্টেল প্রাঙ্গণেই গুলি চালায়নি, গুলি ছুড়েছে রাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো ছাত্র-জনতার ওপরও। সেখানেও হতাহতের ঘটনা লক্ষ করার মতো। যেমন রাস্তার এক কোণে পয়োনিষ্কাশন পাম্পের পাশে উপস্থিত একজন, তেমনি

চৌধুরী পেট্রলপাম্পের পাশে এক কিশোরও গুলিবিদ্ধ হয়, যাকে পুলিশ তুলে নিয়ে যায় বলে দৈনিক *আজাদ*-এ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল।

সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী, পুলিশ আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালায়। কিন্তু পরিস্থিতি বলে, হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে পুলিশ গুলিবর্ষণ করেছিল; নিশ্চিতই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে। আর ওই কর্তৃপক্ষের মধ্যে যেমন অবাঙালি, তেমনি বাঙালিও ছিলেন। দায় তাঁদের সবারই। সবচেয়ে বড় কথা, পুলিশ সেদিন ছাত্রপক্ষের প্ররোচনা ছাড়া এবং কোনো ধরনের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ না করেই নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল; ভয় দেখিয়ে ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে নয়। স্বৈরাচারী শাসকশ্রেণী বরাবর এমনটাই করে থাকে। আর এটাই তাদের জন্য হয়ে ওঠে ইতিহাসের ট্র্যাজেডি।

গুলিবর্ষণের প্রতিক্রিয়ায় পাল্টে গেল পুরান ঢাকা

নিরপরাধ মানুষের হত্যাকাণ্ড ঘিরে তৈরি হয় ব্যক্তিক ও পারিবারিক ট্র্যাজেডি। কিন্তু ইতিহাসের ট্র্যাজেডি ভিন্ন চরিত্রের হয়ে থাকে, যখন মূল হত্যাকারীকে তার কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় কখনো কখনো মাশুল গুনতে হয়। বিশেষ করে, সে মাশুল গোনা যখন সম্পন্ন হয় কোনো দেশ, জাতি বা রাষ্ট্রকে ঘিরে। একুশের ভাষা আন্দোলন যে ট্র্যাজেডির সূচনা ঘটায়, তা দীর্ঘ দুই দশকের নানা বাঁক ফেরার মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের জন্য মুক্তির সনদ বয়ে আনে। মাশুল গোনার আঘাতটা বহন করতে হয় পাকিস্তান নামের একটি স্বৈরতন্ত্রী, অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে।

তাই বলতে হয়, একুশে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে রফিক, বরকত, জব্বার ও নাম-পরিচয়হীন আরও কয়েকজনের আত্মদান বৃথা যায়নি। ২১ তারিখে ব্যারাক প্রাঙ্গণে গুলিবিদ্ধ সালাম অবশ্য মারা যান পরে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। পরবর্তী দিনগুলোতে এ আন্দোলনে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁরাও একই কাতারে রয়েছেন। তাঁদের জীবনদানের ফলেই রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি জনচেতনা স্পর্শ করে, সারা দেশ বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে, সরকারের মৃত্যুঘণ্টা বেজে চলে। মাত্র দুই বছরের মধ্যেই শুধু মুসলিম লীগ সরকারেরই নয়, পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগ দলেরও রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটে। একে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চলে আধাসামরিক শাসন (৯২-ক ধারা) জারি করে। কিন্তু তাতে শেষ রক্ষা হয়নি।

একুশের একগুচ্ছ মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া জনচেতনা স্পর্শ করেছিল বলেই পুরান ঢাকার আমজনতা, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি সম্পর্কে তাদের ভিন্ন মত বুড়িগঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আন্দোলনে শামিল হয়, একাত্ম হয় ছাত্রদের প্রতিবাদী চেতনার সঙ্গে। এর প্রকাশ দেখা যায় একুশে ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকে। কন্ট্রোল রুমের মাইকে রক্তঝরা প্রচার সেদিন গুলিবর্ষণের বার্তা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। দলে দলে মানুষ ছুটে আসতে থাকে হোস্টেল প্রাঙ্গণে, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

সেদিন বিকেলের ঘটনা যেমন ছিল অভাবিত, তেমনি মর্মস্পর্শী। কান্না আর বেদনার প্রকাশ সেদিন নুরুল আমিন সরকারের প্রতি ধিক্কার ছুড়ে দিয়েছিল। ব্যারাক প্রাঙ্গণে ঢাকাই আমজনতার ঢল চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হতো। পুরান ঢাকার নানা বয়সী মানুষ ঘুরে ঘুরে পুলিশি হত্যাকাণ্ডের আলামত দেখে ক্ষোভে উত্তাল হয়েছে। প্রাঙ্গণে রক্তের ছাপ আর হোস্টেলের শেডগুলোতে গুলির চিহ্ন তাদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তা একটিমাত্র বাক্যে প্রকাশ পায় : 'গুলি কইরা ছাত্র মাইরা হালাইছে।' হাসপাতালে তাদের ভিড়ে অন্য রোগীদের জন্য শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই ঢাকাইয়া মানুষই আটচল্লিশে ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে, কেউ কেউ ছাত্রদের ওপর হামলা করেছে। আর একুশের প্রস্তুতিপর্বে তারা এক ধরনের নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েছে। পুলিশের গুলি এবং মৃত্যুর ঘটনাই তাদের সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছিল। তারা ছাত্রদের সঙ্গে এক কাতারে আন্দোলনে শামিল হয়, মূলত তাদের তরুণ সমাজ। অথচ কজনই বা ছিলেন সেদিন একুশের শহীদ? মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র রফিকউদ্দিন মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে তাৎক্ষণিক মৃত্যুবরণ করেন। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকতের উরুতে গুলি লাগে। অস্ত্রোপচার করেও তাঁর প্রাণ বাঁচানো যায়নি। গফরগাঁওয়ের কৃষকযুবা আবদুল জব্বার ঢাকায় আসেন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগীর দেখাশোনা করতে। উঠেছিলেন ২০ নম্বর শেডের ৮ নম্বর কক্ষে। তিনিও পুলিশের গুলির শিকার—ইমারজেন্সিতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে তাঁর মৃত্যু।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ফুলার রোডে পুলিশের গুলিতে অজ্ঞাতনামা কিশোরের মৃত্যু এবং তাকে পুলিশের তুলে নেওয়ার ঘটনা দৈনিক *আজাদ*-এ প্রকাশিত হয়। আর খেলার মাঠের পশ্চিমে রাস্তায় সমবেত জনতার ওপর পুলিশের গুলিতে অন্তত একজন যে শহীদ হয়েছিলেন, তা তৎকালীন মাদ্রাসাছাত্র লোকমান আহমদ আমীমীর ভাষ্যে জানা যায়। সাদা শার্ট ও পায়জামা পরা ওই যুবকেরও পরিচয় মেলেনি, যদিও তাঁকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলে লোকমান আহমদ জানান। ওই দিন গুলিতে আহত আবদুস সালাম অবশ্য ৭ এপ্রিল হাসপাতালে মারা যান।

সব মিলিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির গুলিবর্ষণে ছাত্র-অছাত্র শহীদের সংখ্যা অন্তত ছয়। 'অন্তত' শব্দটির ব্যবহার এ জন্য যে উল্লিখিত একজন ছাড়াও গুলিবিদ্ধ আর কাউকে পুলিশ তুলে নিয়েছিল কি না, তা আমাদের জানা নেই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সাক্ষ্যপ্রমাণে দেখা যায়, ২২ ফেব্রুয়ারিও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। সেদিন ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ইপিআর বাহিনী। কিন্তু ছাত্র-জনতাকে স্তব্ধ করতে পারেনি। একুশে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে আহত হন অনেকে। শুধু হাসপাতালে ভর্তি ব্যক্তিদের সংখ্যাই পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেও ভিন্ন মত।

শুধু পুরান ঢাকায়ই নয়, গুলি ও মৃত্যুর খবরে সেদিন পরিষদ ভবনেও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশসহ একাধিক পরিষদ সদস্য প্রতিবাদে সোচ্চার হন এবং মুখ্যমন্ত্রীকে ঘটনাস্থলে যেতে দাবি জানান। মুখ্যমন্ত্রীর অস্বীকৃতিতে তাঁরা অধিবেশন বর্জন করে হোস্টেল প্রাঙ্গণে চলে আসেন এবং রক্তের ছাপ, দেয়ালে বুলেটের আঘাত-চিহ্ন ঘুরে ঘুরে দেখেন। মাওলানা তর্কবাগীশ কন্ট্রোল রুমের মাইকে 'জালিম সরকারের পদত্যাগ' দাবি করে বক্তৃতাও দেন। অথচ তিনি ছিলেন মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সদস্য। আরও যাঁরা পরিষদ কক্ষ থেকে বেরিয়ে হোস্টেলে আসেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মনোরঞ্জন ধর, খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন প্রমুখ। একুশে ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণের প্রতিক্রিয়া বাস্তবিকই ছিল ব্যাপক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।

একুশের সন্ধ্যারাতটা শাসকদের জন্য ছিল কালবেলার মতো

একুশে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যারাতের সময়টা শাসকদের জন্য বোধ করি কালবেলার মতো হয়ে ওঠে। যেমন পরিবেশে, তেমনি ঘটনার তাৎপর্যে। তখন মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছুটে আশা মানুষের পায়ে পায়ে ওঠা ধুলো আর কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়াটে গন্ধের অবশিষ্ট মিলে এক অভাবিত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ছাত্র-জনতার শোক ও কান্না শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে এক ধরনের ঘৃণা ও শক্তির জন্ম দেয়, যা আন্দোলনের জন্য হয়ে ওঠে বিস্ফোরক পুঁজি। সে পুঁজির সদ্ব্যবহারে পরদিন এগিয়ে আসে ঢাকাই ছাত্র-যুবা-জনতার আবেগ, যা মিছিলে, স্লোগানে ও তৎপরতায় প্রকাশ পায়।

২০ ফেব্রুয়ারি রাতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় এবং পরদিন আমতলার ছাত্রসভায় যেসব ছাত্র-যুবা ও রাজনৈতিক নেতা ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা ভাঙার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, তাদেরই কেউ কেউ একুশের কালসন্ধ্যায় চোখের জলে ভিজে শহীদদের প্রতি সমবেদনা জানাতে এসেও ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে 'হঠকারী পদক্ষেপ' হিসেবে চিহ্নিত করে। বিলুপ্ত সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুব একই মানসিকতায় ২২ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচিসংবলিত ইশতেহারের খসড়ায় স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেন (আবদুল মতিন)।

কিন্তু রক্ত ঝরানো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে উদ্দীপনার জন্ম, তার টানে সেদিন এমন কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় যা একুশের আন্দোলনকে জনসমর্থনে শক্তিমান করে তোলে। সংগ্রাম পরিষদেরই সিদ্ধান্তমতো পরিস্থিতির বিচারে পরিষদ বিলুপ্ত হওয়ার কথা। তাই মেডিকেল কলেজ ইউনিয়নের ভিপি গোলাম মাওলার কক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তাঁকেই সংগ্রাম পরিষদের অস্থায়ী আহ্বায়ক মনোনীত করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির।

সেসব কর্মসূচির মধ্যে ছিল পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি শহীদদের নিয়ে হোস্টেল প্রাঙ্গণে জানাজা অনুষ্ঠান ও শোকসভা, তাঁদের লাশ ও রক্তমাখা কাপড়ের পতাকা নিয়ে ঢাকার রাজপথে মিছিল, বাড়িতে বাড়িতে কালো পতাকা তোলা এবং শোকচিহ্ন হিসেবে প্রত্যেকের বুকে বা বাহুতে কালো ব্যাজ ধারণ। জনমানসে

উদ্দীপনা জোগাতে এবং আন্দোলনের সঙ্গে জনচেতনাকে একাত্ম করে তুলতে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। *ইনসাফ* ও *আজাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য একই কথা বলে।

এদিকে মেডিকেল কলেজের অ্যানাটমি হলের পেছনের ঠান্ডা বারান্দায় আলো-আঁধারে রক্তাক্ত রফিকউদ্দিন শয়ান। অন্যদিকে হাসপাতালের দোতলায় এক কক্ষে আবদুল জব্বারের নিথর প্রাণহীন দেহ। আত্মদানেও বুঝি তাদের ভাষিক দায় শেষ হয়নি। আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ ছাত্রদের প্রবল ইচ্ছা, তারা মিছিলে ছাত্র-জনতার সঙ্গী হন। সে উদ্দেশ্য নিয়েই পরদিনের কর্মসূচি, যাতে ঘাতকদের কর্মকাণ্ডের পাল্টা জবাব দেওয়া যায়। জনতার কাঠগড়ায় তাদের যথাযথ বিচারের ব্যবস্থা করা যায়।

জানাজা, শোকসভা ও মিছিলের সিদ্ধান্ত ছাড়াও সেদিন সন্ধ্যারাতের তৎপরতায় ছিল ওই সময়ের মধ্যেই প্রতিবাদী কর্মসূচিসংবলিত ইশতেহার ছেপে প্রতিটি ছাত্রাবাসে বিতরণ এবং গুরুত্বপূর্ণ ছাত্রাবাস ও সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন। এককথায় একটি সফল আন্দোলনের জন্য কাঠখড় পোড়ানো। এ কাজটা ছাত্র-যুব নেতৃত্ব ঠিকঠাকমতোই করেছিল, যদিও পুলিশের হাত থেকে রফিক-জব্বারের লাশ রক্ষা করতে পারেনি।

কিন্তু গুলিবর্ষণ ও হতাহতের ঘটনার ব্যাপক ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া, বিশেষ করে সাধারণ মানুষের সরকারবিরোধী মনোভাব সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর চতুর প্রশাসনের চেতনায় অশুভ সংকেত ছড়িয়ে দিয়েছিল। মেডিকেল ব্যারাকের কন্ট্রোল রুম থেকে মিছিল-কর্মসূচির বিরতিহীন প্রচার যেমন জনমানসে ক্রমাগত ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছিল, তেমনি সতর্ক করে দিয়ে থাকবে চতুর আমলাতন্ত্রকে। তাই ছাত্রদের চোখ এড়িয়ে গভীর রাতে রফিক-জব্বারের লাশ গুম করে ফেলে পুলিশ। দুপুরে এরাই তুলে নিয়েছিল ফুলার রোড থেকে গুলিবিদ্ধ এক কিশোরকে।

সেদিনই গভীর রাতে বিবেকহীন সরকারের প্রতিনিধিদের উদ্যোগে ওই শহীদদের শেষ আশ্রয় জোটে আজিমপুর কবরস্থানের গণকবরে, তাঁদের স্বাভাবিক দাফনের সব দাবি অগ্রাহ্য করে। মৌলভি গফুর ও ড্রেসার সুরুজ্জামানের সাক্ষ্যে ওই সত্য বেরিয়ে আসে। আর ২২ ফেব্রুয়ারি খুব ভোরে মেডিকেল কলেজের দুই তরুণ ছাত্র আলমগীর ও আমির আহসান ওই কবরের ওপর থেকে রক্তমাখা কিছু কাপড়চোপড়ের অংশ নিয়ে এসে সেই অপকর্মের হদিস জানায়।

লাশ গুম করেও তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি সরকার। সন্ধ্যারাতের শিখা জনমনে ঠিকই আগুন জ্বেলে দিয়েছিল। ছাত্রদের নেওয়া কর্মসূচির তীব্র প্রভাব যে সরকারের জন্য এক অশুভ সংকটকাল তৈরি করেছিল, ২২ ফেব্রুয়ারির গণ-আন্দোলন তার প্রমাণ। আর সে আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে যায় ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা। দিন কয়েকের জন্য ছাত্র এলাকা মুক্ত এলাকায় পরিণত হয়। তাই ঢাকার ডিএসপি সিদ্দিক দেওয়ানের ক্ষুব্ধ মন্তব্য : 'দ্যাশ তো এখন আপনারাই চালাচ্ছেন।'

এলিস কমিশন : বিচারপতির আত্মবিক্রয়

একুশে ফেব্রুয়ারি নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ কতটা সংগত ছিল, সে প্রশ্ন নিয়ে বিব্রত সরকার বিচারপতি এলিসকে তদন্তে নিয়োগ করে। এক সদস্যের ওই তদন্ত কমিশন সরকারের কাছে যে প্রতিবেদন পেশ করে, তা ছিল পক্ষপাতদুষ্ট এবং তাতে ছিল সরকারকে অপরাধমুক্ত করার অপপ্রয়াস। একজন বিদেশি বিচারপতির কাছ থেকে এ ধরনের অনৈতিকতা কারও হিসাবে মেলেনি। তাই ছাত্র-জনমত ও সরকারবিরোধী রাজনৈতিক অঙ্গন একবাক্যে এলিস কমিশনের প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে। পত্রপত্রিকায় চলেছে জোর সমালোচনা।

এলিস কমিশনের মূল বক্তব্য ছিল ছাত্ররা উচ্ছৃঙ্খল, দাঙ্গাবাজ। পুলিশ যুক্তিসংগত কারণেই ২৭ রাউন্ড গুলি চালিয়েছে এবং তারা হোস্টেলের বাইরে থেকে ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করতে গুলিবর্ষণ করেছে। এর অর্থ দাঁড়ায়, পুলিশ তার নিরাপত্তার প্রয়োজনে গুলি করতে বাধ্য হয়েছে। আন্দোলনরত মানুষের ওপর গুলি চালানোর যথার্থতা প্রমাণ করতে এ ধরনের কথা প্রশাসন বা সরকারমাত্রই বলে থাকে। নুরুল আমিন ও তাঁর প্রশাসন কর্তৃপক্ষের মুখেও একই কথা শোনা গেছে।

অথচ ঘটনা ভিন্ন কথা বলে। গুলিবর্ষণের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত হোস্টেল প্রাঙ্গণে ও বাইরে রাস্তায় সমবেত ছাত্রদের মুখে ছিল রাষ্ট্রভাষাবিষয়ক স্লোগান। সেই সঙ্গে সরকার ও পুলিশি তৎপরতাবিরোধী স্লোগান। তবে তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল পরিষদ ভবনের সামনে পৌঁছানো, যে জন্য তারা দলবদ্ধভাবে চেষ্টা করেছে সামনের রাস্তায় পুলিশি বাধা অতিক্রম করতে। কিন্তু পুলিশের লাঠিপেটার মুখে সে চেষ্টা সফল হয়নি। তাদের হাতে না ছিল লাঠি, না ছিল কোনো ধরনের অস্ত্র, যা পুলিশের নিরাপত্তায় হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবে এটা ঠিক যে গুলি চালানোর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছানোর নিরস্ত্র চেষ্টা চালিয়ে গেছে। কমবয়সী স্কুলছাত্রদের কেউ কেউ পুলিশের দিকে ইটপাটকেল ছুড়েছে এ কথা সত্য, পুলিশও পাল্টা সেগুলোই ছুড়েছে ছাত্রদের দিকে। কিন্তু এ ঘটনা কি গুলি চালনার কারণ হতে পারে?

আরও একটি বিষয়ে বিচারপতি এলিস মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর প্রতিবেদন অনুযায়ী পুলিশ হোস্টেল গেটের বাইরে থেকে গুলি চালিয়েছে, ভেতরে ঢোকেনি। হোস্টেলের গেট, রাস্তা ও শেডগুলোর অবস্থান এবং কারও কারও গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা বিচার করে দেখলে এলিস সাহেবের দাবি সঠিক মনে হয় না। কারণ, গেটের বাইরে থেকে চালানো গুলি আঁকাবাঁকা গতিপথে সর্বপশ্চিমে অবস্থিত ২০ নম্বর শেডের বারান্দায় দাঁড়ানো আবদুল জব্বারের তলপেটে আঘাত করতে পারে না। তা ছাড়া পুলিশকে গেটের কিছুটা ভেতরে ঢুকে গুলি করতে উপস্থিত ছাত্রদের অনেকেই তো দেখেছে।

আর ছাত্রদের ছাত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কি কখনো কারও মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে? বুঝতে কষ্ট হয় না যে পুলিশ হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে গুলি ছুড়েছে। তাই বরকতের উরুতে, জব্বারের তলপেটে এবং রাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের পেটে গুলি লেগেছে। ভয় দেখানো গুলিতে ফুলার রোডে উপস্থিত কিশোর মারা যেত না। সত্যি বলতে কি, এলিস কমিশনের গোটা প্রতিবেদনটিই মিথ্যায় ভরা, একজন বিচারকের চরম অনৈতিকতার প্রতিফলন।

এরপরও কথা আছে। মেডিকেল কলেজের যে কজন ছাত্রকে কমিশনে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়েছিল, তারাও একবাক্যে বলেছে, গুলি চালানোর মতো তখন কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। পুলিশ বিনা প্ররোচনায় গুলি চালিয়েছে। তাদের সাক্ষ্য যে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তা থেকেও এলিস সাহেবের পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সহপাঠী অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার ডা. আবদুল মালিকের ভাষ্যেও এ কথা জানা যায়। সে সময় মেডিকেল কলেজের ছাত্র মালিককে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়েছিল। সেই সঙ্গে আরও কয়েকজনকে, যারা সক্রিয় রাজনীতিতে কখনো যোগ দেয়নি। তাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করার পক্ষে যুক্তি নেই।

নুরুল আমিন সরকারের রক্তমাখা নোংরা আস্তিন পরিষ্কার করতে গিয়ে এলিস সাহেব বিচারপতির পবিত্র আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। ঘৃণা কুড়িয়েছিলেন পূর্ববঙ্গের দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতা ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কাছ থেকে। তবে শাসক-সেবার ভালো 'ইনাম' পেয়েছিলেন নুরুল আমিন সরকারের কাছ থেকে। আর সেটাই বোধ হয় তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল। যে জন্য শপথ-ভাঙা অপরাধ করতে এলিস সাহেবের বিবেকে বাধেনি।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের গুলি চালানোর মূল দায়দায়িত্ব শুধু অবাঙালি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোরাইশি, অতিরিক্ত সিটি পুলিশ সুপার মাসুদ মাহমুদ বা চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদেরই ছিল না; ছিল বাঙালি এস.পি মো. ইদরিস, ডিআইজি ওবায়দুল্লাহ ও তাঁর নিকট বাঙালি সহকর্মীদেরও এবং সর্বোপরি মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের। অবাঙালি পাকিস্তানি প্রশাসক ও রাজনীতিকদের মনোভাব সবাই জানি, কিন্তু বাঙালি মন্ত্রী বা প্রশাসকদের ওই

মনোভাবের ব্যাখ্যা কী? সম্ভবত ব্যক্তিস্বার্থ, দলীয় স্বার্থ ও রক্ষণশীল চিন্তা এ ধরনের ন্যায়নীতি-বহির্ভূত কাজে তাঁদের প্ররোচিত করেছিল। সংশ্লিষ্ট রাজনীতিকদের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বার্থপূরণের চিন্তা তো ছিলই। তবে তাদের এ কর্মকাণ্ড আন্দোলনকে তুঙ্গে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল, এই যা। সেই সঙ্গে দেশব্যাপী সরকারবিরোধী মনোভাবের আগুন জ্বেলে দিয়েছিল। যাকে বলে পাল্টা প্রাপ্তি। এ বাস্তবতা বুঝতে পারেনি নুরুল আমিন প্রশাসন।

ছাত্র-জনতার মিলিত লড়াই

একুশের ছাত্র আন্দোলন যেন এক জাদুমন্ত্রে পরদিন গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। একুশে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ছাত্র-জনতার প্রাণদানের প্রতিক্রিয়া হয়ে ওঠে সেই অভাবিত জাদু। ঘাতক শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়ায় ফেটে পড়েছিল আমজনতা। যেমন শহর ঢাকায়, তেমনি দেশের অন্যত্র। এমনকি সে ঢেউ দূর গ্রামের শিক্ষায়তন কেন্দ্র করে জনমনে ছড়িয়ে পড়েছিল। আপাতবিচারে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এই ছিল একুশের ঐতিহাসিক বাস্তবতা।

দিনটা ছিল শুক্রবার, ২২ ফেব্রুয়ারি। অনন্য এ দিনটির সূচনা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে একুশের শহীদদের জন্য অনুষ্ঠিত গায়েবানা জানাজার মধ্য দিয়ে। পুলিশ দুই শহীদের লাশ গুম করার ফলে বাধ্য হয়ে ছাত্র-যুব নেতৃত্বকে বিকল্প হিসেবে গায়েবানা জানাজার ব্যবস্থা করতে হয়। কয়েক হাজার শোকার্ত মানুষের উপস্থিতিতে জানাজার পর ইমাদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত শোকসভা। এরপর হোস্টেল প্রাঙ্গণ থেকে মিছিলের যাত্রা শুরু। মিছিলে এবার আসে নতুন স্লোগান 'শহীদ স্মৃতি অমর হোক'। সেই সঙ্গে ক্রুদ্ধ উচ্চারণ—'খুনি নুরুল আমিনের বিচার চাই', 'রক্তের বদলে রক্ত চাই' ইত্যাদি।

শুক্রবারের বিস্ফোরক পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে বাধ্য হয়। জারি করে সান্ধ্য আইন। তবু অবস্থা আয়ত্তে আসেনি। ছোট-বড় মিছিলে ক্রুদ্ধ জনতার পদচারণে ঢাকা সেদিন মিছিলের শহরে পরিণত হয়। লাল কালিতে লেখা পোস্টার-ফেস্টুন আর উড়ন্ত কালো পতাকা মিলে লাল-কালোর এক আশ্চর্য প্রকাশ। মিছিলে মিছিলে সয়লাব শহরে সেদিন স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল। অনেকটা ওই কবিতার পঙ্‌ক্তির মতো—'আজ হরতাল। আজ চাকা বন্‌ধ।' সত্যি ঢাকার ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশনে রেলের চাকা বন্ধই ছিল।

সেদিন শুধু বাজারহাট, দোকানপাটই বন্ধ থাকেনি, অফিস-আদালতের কর্মচারী এবং কারখানার শ্রমিক (অবশ্য অবাঙালি বাদে) সবাই বিনা আহ্বানে মিছিলে শামিল হয়েছে, বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে। মসজিদে মসজিদে মানুষ

গায়েবানা জানাজা আদায় করে, সেই সঙ্গে মোনাজাত। ক্ষুব্ধ জনতার উত্তাল ঢেউ লক্ষ করেও পুলিশ-ইপিআর বাহিনী তাদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালায়। চলে লাঠিচার্জ আর গুলি। ফলে দ্বিতীয় দিনও হতাহতের ঘটনা ঘটে। তবু মিছিল চলতেই থাকে।

সেদিনের পরিস্থিতি বুঝতে *আজাদ* পত্রিকার দু-একটা ছোট্ট খবরই যথেষ্ট। 'শুক্রবার শহরের অবস্থার আরও অবনতি। সামরিক বাহিনী তলব। পুলিশ ও সেনাদের গুলিতে চারজন নিহত। শতাধিক ব্যক্তি আহত।' এই সঙ্গে আরও লেখা হয় : 'সমস্ত ঢাকা শহরে উত্তেজনাময় পরিস্থিতি বিরাজ করিতে থাকে। সারা শহরটি আপাতদৃষ্টিতে একটি সামরিক ছাউনি বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে' (*আজাদ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। হ্যাঁ, শহর ঢাকা সেদিন সামরিক ছাউনির মতোই মনে হচ্ছিল। কারণ, শহরের পথে পথে সশস্ত্র পুলিশের টহল, বড় রাস্তাগুলোতে সেই সঙ্গে ইপিআরের সেনা মোতায়েন। সামরিক যানগুলোতে অস্ত্রসজ্জিত সেনা-জওয়ান লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। তাদের ধাতব মুখে হিংস্রতার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি।

ক্ষুব্ধ জনতার মিছিল মেডিকেল হোস্টেল থেকে বেরিয়ে হাইকোর্ট-কার্জন হলের পাশ দিয়ে নাজিমুদ্দিন রোড, চকবাজার, ইসলামপুর, সদরঘাট পর্যন্ত পৌঁছাতে অনেকবার লাঠিচার্জের সম্মুখীন হয়েছে। বিশ্বাস করা কঠিন যে এ সময় মিছিলে স্থানীয় লোকজন, দোকানদার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে যোগ দেওয়ায় মিছিল ক্রমেই আয়তনে বড় হয়েছে। এতে বহুসংখ্যক সরকারি কর্মচারীকে যোগ দিতে দেখা যায়। মিছিলের সামনে গুলিতে নিহত-আহতদের রক্তমাখা জামাকাপড়ের অংশবিশেষ লাঠির মাথায় পতাকার মতো উড়ছিল। মূল মিছিল অবশ্য ভিন্ন পথে এগিয়েছে।

নবাবপুর রোডে সেই মিছিল একইভাবে ব্যানার-ফেস্টুন ও স্লোগানসহ মানসী সিনেমা হলের পাশ দিয়ে রথখোলা, ভিক্টোরিয়া পার্ক হয়ে সদরঘাটের দিকে যায়। এ মিছিলেরও আয়তন ছিল বিশাল। আর এ মিছিলে সামরিক যান থেকে একাধিক স্থানে গুলি চালানো হয়। তবু মিছিলের পথচলা বন্ধ করা যায়নি। এ ছাড়া লালবাগ ও সলিমুল্লাহ হলের সামনে থেকেও মিছিল স্লোগান সহকারে পথ চলেছে। এককথায়, গোটা শহরের পথে পথে মিছিল। অন্যদিকে পরিষদ ভবনের সামনে ছিল একাধিক মেশিনগান। হোস্টেলের সামনে টহল চলেছে অস্ত্রধারী জওয়ানদের।

২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশ ও সেনা জওয়ানদের গুলিতে শহীদ হন হাইকোর্টের কর্মচারী সফিউর রহমান, রিকশাচালক আবদুল আউয়াল, কিশোর অহিউল্লাহ, তাঁতীবাজারের যুবক সিরাজউদ্দিন এবং নাম না-জানা আরও কয়েকজন, যাদের সামরিক যানে ও পুলিশ ভ্যানে তুলে নিতে দেখা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে দৈনিক *আজাদ* সেই খবর ছাপে। কাজেই ২২ ফেব্রুয়ারি গুলিতে, বেয়নেটের আঘাতে ঠিক কতজন হতাহত হয়েছিলেন, সে খবর কখনোই জানা যাবে না।

ছাত্র আন্দোলন ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়ে পরিস্থিতি সরকারের জন্য এমনই বিপজ্জনক করে তুলেছিল যে *আজাদ*-এর মতো রক্ষণশীল পত্রিকায়ও লিখতে হয়। 'গত দুই দিন ধরিয়া ঢাকা শহরের বুকে যেসব কাণ্ড ঘটিতেছে, সে সমস্ত শুধু শোকাবহ নয়, বর্ব্বরোচিত বটে।' তা ছাড়া মন্ত্রিসভার পদত্যাগের দাবিও জানায় *আজাদ*। রাষ্ট্রভাষা বাংলা সম্পর্কে তখন ওই পত্রিকার মন্তব্য : 'এ যদি এখানকার জনমতের দাবি হয়, তবে পাকিস্তানকে ইহা মানিয়া লইতে হইবে।' অবশ্য পরে *আজাদ* তার অবস্থান পাল্টে বিপরীতমুখী হয়েছিল।

তবু প্রথম দু-তিন দিন *আজাদ*-এর প্রতিবেদন ও ঘটনাদৃষ্টে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করা চলে। এবং চলে কুখ্যাত *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার ছাপাখানা 'জুবিলি প্রেস' পুড়ে ছাই হওয়ার ঘটনা থেকে। ঢাকাইয়া তরুণদের ক্ষোভ এভাবে প্রকাশ পায়। তারা ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি প্রেসের কাছে আসতে দেয়নি। এর কারণ রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে *মর্নিং নিউজ*-এর সাম্প্রদায়িক অপপ্রচার ও মিথ্যা খবর পরিবেশন, এককথায় আন্দোলনের বিরোধিতা।

পুলিশের যুক্তিহীন গুলিবর্ষণের কারণে ঢাকার মানুষ, বিশেষ করে তরুণ সমাজ এতটা ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে যে সশস্ত্র পুলিশের লাঠিচার্জ, সেনা জওয়ানদের বেয়নেট চার্জ এবং যত্রতত্র মিছিলের ওপর সেনা ও পুলিশের গুলিবর্ষণ ছাত্র-জনতাকে সাময়িক ছত্রভঙ্গ করেছে, কিন্তু পথ থেকে সরাতে পারেনি। জওয়ানদের বেপরোয়া মনোভাব সম্পর্কে *আজাদ* (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২) লেখে : 'গতকল্যকার ঘটনার বিশেষত্ব হইল সৈন্যগণকে অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গিনের খোঁচায় বিক্ষোভকারিগণকে ঘায়েল করিতেও দেখা যায়।' এত সব সত্ত্বেও ছাত্র-জনতার মিছিল দিনভর ঢাকার ছোট-বড় সব রাস্তাই দখল করে রেখেছিল।

গণ-আন্দোলনের বিপদ আঁচ করে সরকার দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করে। কারণ, একদিকে ছাত্র-জনতার অনমনীয় সরকারবিরোধিতা, অন্যদিকে ঘাতক পুলিশ বাহিনীসহ সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিচারের দাবি, যেমন পত্রপত্রিকার সম্পাদকীয় কলামে, তেমনি বিভিন্ন প্রতিবাদ সভায় এবং কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতার কণ্ঠে। এটা মুখ্যমন্ত্রীর জন্য মোটেই স্বস্তিদায়ক ছিল না। তা ছাড়া সেদিন মিছিলে 'নুরুল আমিনের কল্লা চাই' স্লোগানও হয়তো তাঁর কানে গিয়ে থাকবে।

তাই সরকার আন্দোলনের মোকাবিলায় যেমন পুলিশসহ ব্যাপক সেনা টহলের ব্যবস্থা করে, রাতে কারফিউ জারি করে, তেমনি পূর্ববঙ্গ আইনসভায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সুপারিশ প্রস্তাব পাস করে। আবার একই সঙ্গে নানা ধরনের অপপ্রচারের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের চরিত্র হননের চেষ্টা করে। অর্থাৎ আন্দোলনের প্রেরণা ও শক্তি ভারত থেকে এসেছে, রাষ্ট্রদ্রোহী ও কমিউনিস্টরা

পাকিস্তানকে ধ্বংসের জন্য ভাষার নামে আন্দোলনে নেমেছে, এমন প্রচারও শুরু করে। মুখ্যমন্ত্রীর বেতার ভাষণে ওই মিথ্যাচার নিলর্জ্জভাবে প্রকাশ পায়।

শুরু থেকে পাকিস্তানি শাসন এ ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতি বরাবর চালিয়ে এসেছে। ভারত-বিদ্বেষ পুঁজি করে যেকোনো ধরনের আন্দোলন স্তব্ধ করার চেষ্টা করেছে। পাকিস্তান এখনো ষড়যন্ত্রের রাজনীতি থেকে সরে আসতে পারেনি। আর পারেনি বলে ঘর সামলাতে ও ঠিকঠাক রাখতে একুশ শতকে পৌঁছেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে হিমশিম খেতে হচ্ছে, সামরিক-বেসামরিক উভয়বিধ শাসনে।

আন্দোলন অব্যাহত, প্রতিক্রিয়া ও সম্ভাবনা

ঝোড়ো হাওয়ার উদ্দামতা নিয়ে বৃহস্পতি, শুক্র (২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি) দুটি দিন শেষ হয়, কিন্তু বিক্ষোভ-আন্দোলন শেষ হয় না। শহর ঢাকা তখনো ছাত্র নেতৃত্বের ছকমাফিক চলতে থাকে। ১৮ বছর পর এমন ঘটনা আরও ব্যাপকভাবে দেখা গেছে জাতীয় চেতনার টানে। বায়ান্নতে তার সূচনা। ঢাকার পথে পথে মিছিলের পর মিছিল। এমনই এক ক্লান্ত মিছিলে শক্তি সঞ্চার করতে জনৈক বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্র সজোরে স্লোগান তোলে: 'রাষ্ট্রভাষা রাষ্ট্রভাষা—বাংলা চাই বাংলা চাই'। এরপর সেই আবেগের টানে হঠাৎই উচ্চারিত হয়: 'বাংলা ভাষা বাংলা ভাষা: রাষ্ট্র চাই রাষ্ট্র চাই'। মিছিলে তখন চাপা হাসি। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক ওই স্লোগানে সেদিন কি দেশের রাজনৈতিক ভবিতব্য ভর করেছিল? ভর করেছিল ভাষিক রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা? স্লোগান শুধরে নিয়ে মিছিল আবার পথ চলতে থাকে। এ ঘটনা ঘটেছিল ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের সামনের রাস্তায়।

শনিবারও (২৩ ফেব্রুয়ারি) যথারীতি স্বতঃস্ফূর্ত পূর্ণ হরতাল, মিছিলে-স্লোগানে সরব ঢাকা আন্দোলনের অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে। ১৪৪ ধারার মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে রাজপথে জনতার ঢল। তা সত্ত্বেও পুলিশের লাঠিচার্জ ও রাতের কারফিউ অব্যাহত থাকে। সেনা জওয়ানদের টহল বন্ধ হয় না। সেসব উপেক্ষা করে সচিবালয়সহ অফিস-আদালতে ধর্মঘট চলছে, রেল বন্ধ, এয়ার অফিস বন্ধ। বাঙালি রেল কর্মচারীদের ওপর গুলি চলে এবং অভাবিত ঘটনা যে গুলি চালাতে অস্বীকার করায় পুলিশের একাংশের অস্ত্র 'সিজ' করা হয়। গ্রেপ্তার হন এক হাবিলদারসহ কয়েকজন পুলিশ সদস্য। একুশের আবেদন ছিল এতটাই গভীর, এতটাই হৃদয়স্পর্শী।

সেনাবাহিনী মেডিকেল ব্যারাকের কন্ট্রোল রুম থেকে বেয়নেটের মুখে মাইক ছিনিয়ে নেওয়ার পর সুরক্ষিত সলিমুল্লাহ হলের মাইকই প্রধান ভূমিকা পালন করে। এর সার্বক্ষণিক দায়িত্বে ছিলেন ওই হলের বাসিন্দা ইকরামুল আমিন। ফজলুল হক হলেও তখন আন্দোলনের কর্মসূচি ও অন্যান্য প্রচারের জন্য কন্ট্রোল রুম খোলা হয়। কিন্তু এহ বাহ্য। একুশের দুই দিনব্যাপী ঘনঘটার প্রতিক্রিয়ায় দেখার মতো

বিষয় ছিল পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন। শুধু নিরক্ষবলয়ই নয়, ডানপন্থী অনেক সংগঠনই তখন পুলিশি জুলুমের নিন্দায় সোচ্চার হয়ে ওঠে। আলিয়া মাদ্রাসা, তিব্বিয়া হাবীবিয়া কলেজও বাদ যায় না। ব্যাংক কর্মচারী সমিতিও এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকেনি।

তবে রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পরিষদ সদস্য আবুল কালাম শামসুদ্দিনের পর মাওলানা তর্কবাগীশেরও পদত্যাগ। সরকারবিরোধী মনোভাবের ব্যাপক বিস্তার মুসলিম লীগ দলে ভাঙনের সূচনা ঘটায়। জনাব তর্কবাগীশের পথ ধরে একাধিক সদস্য মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন। শামসুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত হয় আইন পরিষদে নতুন বিরোধী দল। সরকারবিরোধী প্রতিক্রিয়ার টানে আরও গঠিত হয় 'ব্যক্তিস্বাধীনতা কমিটি'। এতে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন শেরেবাংলা, মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম, কামরুদ্দীন আহমদ, আনোয়ারা খাতুন প্রমুখ। সরকার ও তার দলের পায়ের নিচ থেকে এভাবে মাটি সরে যেতে থাকে।

স্বনামখ্যাত ব্যক্তি অনেকে সরকারি অনাচারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভে-প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এ কে ফজলুল হক ছাত্রদের দাবি জয়যুক্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে জানান। আর মওলানা ভাসানী তাঁর স্বভাবসুলভ কণ্ঠে বলেন: 'আমি দাবি করি অবিলম্বে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হোক, পুলিশি গুলির তদন্তের জন্য হাইকোর্টের জজ ও জনপ্রতিনিধি নিয়ে কমিশন গঠন করা হোক। আমি অপরাধীদের প্রকাশ্য বিচার দাবি করিতেছি।' তাঁর মতে, নুরুল আমিন ইতিহাসের দাবি অস্বীকার করছেন। অত্যাচার মানুষের বিক্ষোভ বাড়ায়, চাপা দিতে পারে না।

তবে ব্যক্তিক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর হলো, মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি মোহন মিঞার বিবৃতি: 'ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের সংবাদ শুনিয়া স্তম্ভিত হই।...অবিলম্বে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি কর্তৃক পুলিশি জুলুমের তদন্তের জন্য সরকারের নিকট দাবি জানাইতেছি।' তাঁদের পার্লামেন্টারি পার্টির সভায় ছাত্রদের পক্ষে আরও একাধিক প্রস্তাব গ্রহণের ঘটনা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য। এসবের পেছনে উদ্দেশ্য যা-ই থাক, এ কথা ঠিক যে একুশের আন্দোলন সরকার ও ক্ষমতাসীন দলকে গভীর সংকটে ফেলে দিয়েছিল। বিনষ্ট ভাবমূর্তি উদ্ধারই তখন তাদের প্রধান লক্ষ্য। অর্থাৎ সংকট থেকে উত্তরণ।

একুশের আন্দোলন সূচনা-দিন থেকে দেশময় যে বিক্ষোভ-প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়, তা মূলত শিক্ষায়তনকেন্দ্রিক তথা ছাত্র-অঙ্গনের হলেও এর প্রভাব জনমন স্পর্শ করেছিল। এর কতটা রাজনৈতিক সচেতনতাসিদ্ধ, সে বিষয়ে কোনো জরিপের হিসাব নেই। কিন্তু প্রভাব ছিল বলেই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা দল মুসলিম লীগ দুই বছরের মধ্যেই নির্বাচনে চরম পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। এটা সত্যই

অবিশ্বাস্য ঘটনা। মাতৃভাষার সঙ্গে মানুষের নাড়ির বন্ধন থাকে বলেই সেখানে আঘাত চেতন-অচেতনের হিসাব ছাড়িয়ে যায়।

বোদ্ধা রাজনৈতিক বিশ্লেষক কারও কারও ধারণা, এর প্রভাব পশ্চিম পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক রাজনীতিতেও কিছুটা পড়েছিল। গণতন্ত্রী ও বামপন্থী নেতারা এর সঠিক মূল্যায়নে রাজনৈতিক সম্ভাবনার কথাও ভাবেন। তাই মিয়া ইফতেখারউদ্দিন, জি এম সৈয়দ, আবদুল মজিদ সিন্ধী প্রমুখ পূর্বোক্ত ঘরানার নেতা এককাট্টা হয়ে নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করতে ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। মাত্র দিন কয়েকের আয়ু নিয়ে একুশে ইতিবাচক এক রাজনৈতিক সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছিল। একুশের তাৎপর্য নিয়ে যাঁরা ভাবেন, তাঁরা এ কথা মানেন।

শহীদ স্মৃতি অমর করে রাখতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ

জাতীয় জীবনে কখনো কখনো এমন কিছু ঘটে, যার প্রতীকী রূপ সেই জাতিকে পথ দেখায়; হয়ে ওঠে প্রেরণার উৎস। একুশের ভাষা আন্দোলন তেমন একটি প্রতীকী উৎস 'শহীদ মিনার' জাতিকে উপহার দিয়েছে। শহীদ মিনার আমাদের জন্য হয়ে আছে প্রতিবাদ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতীক। সর্বোপরি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রেরণা। আর সে জন্য আমাদের বারবার যেতে হয় ওই শহীদ মিনারে। যেতে হয় পথ ঠিক করে নিতে, আদর্শিক শক্তি অর্জনের জন্য।

একুশের রক্তাক্ত স্মৃতি নিয়ে ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথ যখন ছাত্র-জনতার প্রতিবাদী পদচারণে উত্তাপ ছড়াচ্ছে, তখন সবকিছু ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছিল 'শহীদ স্মৃতি অমর হোক' স্লোগান। আর শহীদ স্মৃতি অমর করে রাখতে হঠাৎ করেই মেডিকেল কলেজের কয়েকজন ছাত্রের মনে এল একটা ছোটখাটো স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির কথা। হোক না ছোট। প্রতীকের গুরুত্ব ছোট-বড়র হিসাব মানে না। যেমন ভাবা তেমন কাজ।

দিনটা ছিল ২৩ ফেব্রুয়ারি। গোলাম মাওলাসহ আন্দোলনে সক্রিয় নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ছাত্র পুলিশের গুলি ও শহীদদের নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে হোস্টেল প্রাঙ্গণে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির সিদ্ধান্তে আসেন। আলোচনা চলে কীভাবে কারফিউয়ের মধ্যে কাজটা শেষ করা যাবে। এ কাজের পরিকল্পনা থেকে শেষ পর্যন্ত সবই ছিল যৌথ চিন্তা ও সম্মিলিত শ্রমের ফসল। আর একান্তভাবেই তা করেছেন মেডিকেল ব্যারাকের ছাত্ররা। বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো সংগঠনের নেতা-কর্মী এতে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাননি। এ সত্যটা একুশের ইতিহাস পাঠক মাত্রেরই জানা দরকার।

যেকোনো স্থাপত্যকাজের জন্য দরকার নকশা। শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির জন্য নকশা আঁকার দায়িত্ব পড়ে বদরুল আলমের ওপর। পরে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন সাঈদ হায়দার। গুটিকয় খসড়া রেখাচিত্র বাতিলের পর যেটা গৃহীত হলো, সেটার ওপর ভিত্তি করেই স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির প্রস্তুতি শুরু হয়। কলেজ সম্প্রসারণ কাজের জন্য কলেজ প্রাঙ্গণে জমা করা ইট-বালু ব্যবহারে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু সিমেন্ট তো গুদামে তালাবদ্ধ।

তাই যেতে হলো কলেজের কাজের জন্য মনোনীত সাব-কন্ট্রাক্টর পিয়ারু সরদারের কাছে। সব শুনে সরদার সাহেব নির্দ্বিধায় ছাত্রদের হাতে গুদামের চাবি তুলে দিয়ে বলেন, যে কয় বস্তা দরকার তা নিয়ে গুদাম বন্ধ করে চাবিটা যেন তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়। একুশে এবং ছাত্রসমাজ জনমনে কতটা স্থান করে নিয়েছিল, এ ঘটনা থেকে তা বোঝা যায়। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে নকশা আঁকিয়ে হিসেবে সম্প্রতি কারও কারও লেখায় নতুন নাম যোগ করা হচ্ছে, যা একান্তই উদ্দেশ্যমূলক ও একেবারেই ভিত্তিহীন।

নকশা, মালমসলা, এমনকি একজন রাজমিস্ত্রিও জোগাড় হওয়ার পর এবার স্থান নির্বাচন। ১২ নম্বর শেডের সামনে এবং হোস্টেলের হাঁটাচলার রাস্তাটার পাশে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির স্থান ঠিক হয়। জায়গাটা বরকতের গুলিবিদ্ধ হওয়ার স্থান থেকে সামান্য দূরে। এ স্থাপত্যকর্ম তদারকির দায়িত্বে ছিলেন কলেজ ইউনিয়নের তৎকালীন জিএস শরফুদ্দিন আহমদ, যিনি বন্ধুদের কাছে ইঞ্জিনিয়ার নামে পরিচিত ছিলেন। কারণ, ওই কাজের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন, পরে আসেন ডাক্তারি পড়তে।

কারফিউর রাত। গেটের বাইরে রাস্তায় সশস্ত্র টহলদারি। এর মধ্যেই সাহসী ছাত্ররা খাওয়াদাওয়া শেষে রাত ১০টা থেকে কাজ শুরু করে দেন। হোস্টেলে উপস্থিত প্রায় সবাই একটুখানি হলেও কাজে হাত লাগিয়েছেন। এমনকি হোস্টেলের বয়-বাবুর্চিরাও। কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে মানববন্ধনের মতো করে দাঁড়িয়ে হাতে হাতে ইট টানা, হাসপাতালের স্ট্রেচারে বালু আর সিমেন্ট বহনের মতো কাজ সবই ছাত্রদের শ্রমে। বলতে হয়, সে রাতে জোগালি-শ্রমিকের কাজ করেছিল মেডিকেল হোস্টেলের বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র।

খুব ভোরে কাজ শেষ। সারা রাতের ঘামঝরানো শ্রম শেষে যে স্মৃতিস্তম্ভের স্থাপত্য তৈরি হয়, তা ছিল সাড়ে ১০ ফুট উঁচু, ছয় ফুট চওড়া। এর নামফলকে লেখা 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ', ফলকের আঁকিয়ে বদরুল আলম। পলেস্তারার কাজ শেষ হলে কালো কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয় স্থাপত্যটি। ছোট ছোট খুঁটি পুঁতে দড়ি বেঁধে ঘিরে দেওয়ার পর দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় লাল অক্ষরে লেখা পোস্টার। তাতে ছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'শহীদ স্মৃতি অমর হোক', 'সর্বস্তরে বাংলা চালু কর', 'রাষ্ট্রভাষা তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন' ইত্যাদি।

সারা রাতের শ্রম শেষে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির কারিগর সবাই যে যার ঘরে। তখন তারা ভাবতেও পারেনি, এ স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে শহরের মানুষ—নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ সবাই গভীর আবেগ নিয়ে ছুটে আসবে। আর তাদের হাতে এক রাতের শ্রমে গড়া স্মৃতিস্তম্ভ মাজারের মর্যাদা পেয়ে যাবে। বাস্তবে তা-ই ঘটেছিল। কুয়াশাভেজা ভোরের সেই স্মৃতি কখনো ভুলে যাওয়ার নয়। বিশেষ করে যখন তা এক ঐতিহাসিক স্থাপত্যের সমাপন।

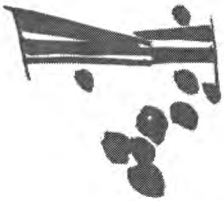

শহীদ মিনার স্মৃতির মিনার

২৪ ফেব্রুয়ারি রোববার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন। মিষ্টি রোদের সকালে মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে সদ্য তৈরি শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের পাশে দাঁড়ানো মেডিকেল কলেজের কয়েকজন ছাত্র। গায়ে পাতলা চাদর। কিছুটা অবাক দৃষ্টিতে ওরা চেয়ে আছে ওদেরই তৈরি সৃষ্টিকর্মের দিকে। ভাবতে পারছে না বিনা উপদ্রবে কীভাবে কাজটা শেষ হলো। বেলা বেড়ে যেতে তারা দেখে, দু-চারজন করে মানুষ আসছে স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে। তাদের চোখে বিস্ময় আর বিনম্র শ্রদ্ধার প্রকাশ। এত তাড়াতাড়ি কী করে ওরা খবর পেয়ে গেল কে জানে?

যেভাবেই হোক খবর তাদের কাছে পৌঁছে গেছে। শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে মানুষ আসছে, মানুষ যাচ্ছে। দেখতে দেখতে স্মৃতিস্তম্ভ ঘিরে মানুষের উপস্থিতি বাড়তে থাকে। স্মৃতিস্তম্ভের বেদিতলে ফুল, টাকা-পয়সা, এমনকি কখনো অলংকার মানুষের হৃদয় উজাড় করা শ্রদ্ধা-ভালোবাসার প্রকাশ ঘটায়। উপস্থিত দর্শনার্থীদের মধ্যে পুরান ঢাকার বাসিন্দাই বেশি। হতে পারে তারা বিগত দিনের ভুল শুধরে নিচ্ছে। একদিকে ভাষার প্রতি মমতা ও আন্দোলনের প্রতি সমর্থন, অন্যদিকে সরকারের প্রতি ঘৃণা ও বিরূপতার প্রকাশ।

শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। জনমনে শাসকদের প্রতি ঘৃণা নতুন করে বেড়ে ওঠে। ২৪, ২৫, ২৬ ফেব্রুয়ারি—এ তিন দিন ব্যারাক প্রাঙ্গণ আবার জনতার ভিড়ে ভিন্ন চেহারা পেয়ে যায়। এসব খবর নিশ্চয়ই সরকার ও প্রশাসনিক কক্ষে পৌঁছে থাকবে। ২৫ ফেব্রুয়ারি দৈনিক *আজাদ* স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির খবরটা এভাবে ছাপে: 'শহীদ বীরের স্মৃতিতে'/'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের যেসব শহীদ বীর গত ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের নিষ্ঠুর গুলিতে বুকের রক্তে ঢাকার মাটি রাঙাইয়া দিয়াছেন তাহাদিগকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণ হোস্টেল প্রাঙ্গণে নিজ হস্তে এক রাত্রির মধ্যে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছেন।'

নিজেদের কৃতিত্বে উদ্দীপ্ত মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের দু-একজনের উদ্যোগে তড়িঘড়ি শহীদ সফিউর রহমানের বাবাকে দিয়ে স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন করানো হয়। পরে

সর্বজনীন সিদ্ধান্তমাফিক আইন পরিষদ থেকে ইস্তফা দেওয়া আবুল কালাম শামসুদ্দিন ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন করেন। উপস্থিত মেডিকেলছাত্রদের দু-একজন ওই অনুষ্ঠানের ছবিও তোলেন। দু-তিন দিনের মধ্যেই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে ওঠে আলোচনার অন্যতম বিষয়—ঘরে-বাইরে, অন্দরমহলে। হয়ে ওঠে আন্দোলনের জন্য নতুন প্রেরণা। তখনো ঢাকায় হরতাল চলছে, পথে পথে মিছিলও চলছে।

এসব দেখেশুনে হয়তো শাসকশ্রেণীর টনক নড়ে। আন্দোলনে নতুন করে উদ্দীপনার উৎস স্মৃতিস্তম্ভটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় নুরুল আমিন প্রশাসন। শক্তিমান এ শত্রুকে তারা নিশ্চিহ্ন করার তাগিদ অনুভব করে। কারণ, জীবিত শত্রুকে গুলি করে মারা যায় কিন্তু ইটের পাঁজরে গুলি লক্ষ্য ভেদ করে না। তাই ঠিক আড়াই দিনের মাথায় অর্থাৎ ২৬ ফেব্রুয়ারি শেষ বিকেলে স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙে ফেলার কাজ শেষ করে সশস্ত্র পুলিশ।

সেদিন শেষ বিকেলে হঠাৎ আসা একদল সশস্ত্র পুলিশ মেডিকেল হোস্টেল ঘিরে ফেলে। অন্যরা ট্রাক ভর্তি সরঞ্জাম নিয়ে ভেতরে ঢোকে। রাইফেল হাতে কয়েকজন পুলিশ উপস্থিত ছাত্রদের দিকে তাক করে বসে থাকে। এবারও সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে নিরস্ত্র ছাত্রদের পক্ষে লড়াই করা সম্ভব ছিল না। তাই বাঁচানো যায়নি মমতায় গড়া শহীদ স্মৃতিস্তম্ভটি। অসহায় চোখে তাকিয়ে দেখা ছাড়া কিছু করার ছিল না তাদের। তাদের চোখের সামনে স্মৃতিস্তম্ভটি ভেঙে টুকরো টুকরো করে ট্রাকে তুলে নিয়ে চলে যায় পুলিশ। মাটি খুঁড়ে শেষ ইটটিও তুলে নেয় তারা। পেছনে পড়ে থাকে ধোঁয়া আর ধুলো। সেই সঙ্গে স্মৃতি।

পরদিন দৈনিক *আজাদ*-এ ছোট্ট এক টুকরো খবর ছাপা হয়: 'গতকল্য মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে শহীদানের যে স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন করা হয়েছিল পুলিশ সন্ধ্যায় তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।' ব্যস, এটুকুতেই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের নিশ্চিহ্ন হওয়ার বার্তা সম্পন্ন। কিন্তু নুরুল আমিন সরকার বুঝতে পারেনি যে ইটের স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙে ফেলা গেলেও একুশের প্রতীক এ স্মৃতিস্তম্ভ মানুষের মন থেকে মুছে ফেলা যাবে না। এ ক্ষেত্রে ঠিকই ব্যর্থ হয়েছিল সরকার।

কারণ, এ স্মৃতিস্তম্ভের আদলে এবং পরে অন্য চেহারায় দেশময় ছোট-বড় নানা আকৃতির শহীদ মিনার গড়ে উঠেছিল। যেমন শিক্ষায়তন প্রাঙ্গণে, তেমনি অন্যত্র। শহীদ মিনার স্মৃতির মিনার হয়ে স্থায়িত্ব পেয়েছে। বলা দরকার, প্রথম শহীদ স্মারক স্থাপত্যটি 'স্মৃতিস্তম্ভ' নামে গড়া হলেও মানুষের মুখে মুখে তা শহীদ মিনার নামে পরিচিতি পেয়ে যায়। পরে এ নামটি স্থায়ী হয় এবং সরকারি পরিকল্পনায় নতুন করে শহীদ মিনার তৈরি করা হয়। একাত্তরে পাকিস্তানি সেনারা ধ্বংস করেছিল শহীদ মিনার। তবু ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে কালজয়ী হয়ে রয়েছে একুশের সংগ্রামী চেতনার প্রতীক শহীদ মিনার, যা জাতীয় চেতনারও প্রতীক। স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙা প্রসঙ্গে আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতাটির আবেগ ও উদ্দীপনা কখনো ভুলে যাওয়ার মতো নয়।

মূল পরিকল্পনার শহীদ মিনার গড়ে তোলা হোক

মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের মুসলিম লীগ সরকার মেডিকেলছাত্রদের হাতে গড়া 'শহীদ স্মতিস্তম্ভ' ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে গুঁড়িয়ে ফেলে। কিন্তু শহীদ স্মৃতির প্রতীক মরেনি। দেশের সর্বত্র গড়ে উঠেছিল শহীদ মিনার নামে শহীদ স্মৃতির প্রতীক ছোট-বড় স্থাপত্য। একুশের আন্দোলন যেমন গণতন্ত্রমনা রাজনীতিকদের উদ্বুদ্ধ করেছিল রক্তাক্ত একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবসের মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে এবং অনুকূল পরিবেশে ওই দিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করতে, তেমনি আড়াই দিন স্থায়ী প্রথম শহীদ মিনার পথ তৈরি করেছিল জাতীয় পর্যায়ে শহীদ মিনার তৈরির দায় পূরণ করতে। অস্বীকার করা কঠিন, স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় ওই স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি না হলে শহীদ স্মৃতির স্মরণে শহীদ মিনার তৈরি হতো কি না, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

নির্বাচনে বিপুল বিজয় অর্জনের পর ১৯৫৪ সালে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর যুক্তফ্রন্ট সরকার ওই সব দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছিল। কারণ, ওগুলো ছিল যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার, ২১ দফার অংশ। কিন্তু কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের ষড়যন্ত্রে ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল এবং পূর্ববঙ্গে ৯২-ক ধারার আধা-মার্শাল ল জারি হওয়ার পর ওই সব প্রতিশ্রুতি পূরণের সম্ভাবনায় বাধা পড়ে।

কিন্তু ১৯৫৬ সালে কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকারের মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমলে একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালিত হয় এবং ওই দিন মিনারের বর্তমান অবস্থানের স্থানটিতে শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এতে অংশ নেন আবু হোসেন সরকার, মওলানা ভাসানী ও শহীদ বরকতের মা হাসিনা বেগম। মন্ত্রিত্বসংকট নিয়ে ব্যতিব্যস্ত সরকার সাহেবের আমলে শহীদ মিনারের কাজে হাত লাগানো সম্ভব হয়নি।

এরপর আওয়ামী লীগ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান শহীদ মিনার তৈরির কাজ হাতে নেন। শিল্পী হামিদুর রহমানের নকশা অনুযায়ী ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে শহীদ মিনারের কাজ শুরু হয়। প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি ছিল বিশাল ও আকর্ষণীয়, সঙ্গে ছিল নভেরা আহমদের ভাস্কর্যের সংযোজন। সন্দেহ নেই,

পরিকল্পিত নকশা ও মডেল পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে শহীদ মিনার শিল্পগুণে দেশ-বিদেশে অনেক সমাদর পেত।

এত বড় কাজের জন্য দরকার পড়ে পর্যাপ্ত সময়। পরবর্তী তিন মাস কঠিন পরিশ্রমের ফলে তৈরি হয় মিনারের ভিত, মঞ্চ ও তিনটি স্তম্ভ। এ ছাড়া হাজার বর্গফুটের একটি ম্যুরাল চিত্রের দুই স্তরের কাজও শেষ হয় এবং নভেরা আহমদ তিনটি ভাস্কর্যের কাজও এ সময়ের মধ্যে শেষ করেন। বাংলা বর্ণমালা দিয়ে সাজানো রেলিং এবং অন্যান্য কাজে যে রোমান্টিক বাস্তবতা ধরা ছিল, বর্তমান লেখার ছোট্ট পরিসরে তা বিশদ বলা সম্ভব নয়।

মূল পরিকল্পনামাফিক কাজ শুরু হলেও সরকারি হস্তক্ষেপে সংক্ষেপে দ্রুত কাজ শেষ করার চেষ্টা চলে। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয় না। মিনারের কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় বন্ধ হয়ে যায় ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খাঁর সামরিক শাসনের কারণে। শহীদ মিনার সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ এতটাই প্রবল ছিল যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন থেকে শুরু করে এ সময় অসম্পূর্ণ স্থাপত্যেই প্রতিটি একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষাপ্রেমী মানুষ ফুল দিয়েছে, আনুষ্ঠানিক কর্তব্য শেষ করেছে।

এরপর পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় গভর্নর আজম খানের আগ্রহে ১৯৬২ সালে অসমাপ্ত শহীদ মিনারের কাজ শেষ করার জন্য ১৪ সদস্যের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন যে কমিটি গঠিত হয়, তাতে সংস্কৃতি অঙ্গনের নামীদামি ব্যক্তি অনেকে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দুঃখজনক যে ওই কমিটি গোটা পরিকল্পনা ছেঁটেছুটে সংক্ষিপ্ত আকারে কাজ শেষ করার যে সুপারিশ করে, তাতে একটি সুন্দর ও সম্ভাবনাময় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের অপমৃত্যু ঘটে। তড়িঘড়ি করে সংক্ষিপ্ত আকারে শহীদ মিনারের কাজ শেষ হওয়ার পর ১৯৬৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি এর উদ্বোধন করেন এবারও হাসিনা বেগম।

এটাই আমাদের বহু পরিচিত শহীদ মিনার, যা হয়ে উঠেছে আমাদের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আদর্শিক কেন্দ্রবিন্দু। তাই একাত্তরে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণে ধ্বংস হয় শহীদ মিনার। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম শহীদ দিবস উদ্‌যাপিত হয় ওই ধ্বংসস্তূপেই। এরপর স্বাধীন বাংলার কারিগরদের হাতেও শহীদ মিনারের কাজ শেষ হয় জোড়াতালি দিয়ে (১৯৭৩)। মূল পরিকল্পনার দিকে ফিরে তাকানোর সময় হয়নি কারও। এমনকি রাষ্ট্রপতি এরশাদ কিছুটা সংস্কারে হাত দিলেও মূল কাজ অধরাই থেকে যায়।

শহীদ মিনারটিকে মূল পরিকল্পনায় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রতিটি সরকারের অবহেলা দুঃখজনক। অথচ শহীদ মিনার নিয়ে তাদের গর্বের শেষ নেই। তাই আমাদের দাবি, হামিদুর রহমানের মূল পরিকল্পনা, মডেল ও নকশামাফিক শহীদ মিনার নতুন করে নান্দনিক স্থাপত্যে গড়ে তোলা হোক। জাতীয় চেতনার প্রতীক বলে বর্তমান সরকারেরও এটা দায় এবং কর্তব্য।

আক্রমণে আত্মরক্ষার চেষ্টা কোণঠাসা মুখ্যমন্ত্রীর

২১, ২২, ২৩ ফেব্রুয়ারি গোটা ঢাকা শহর রাষ্ট্রভাষার দাবি নিয়ে আন্দোলনে সরগরম। এ কদিনে অনেক হতাহত। ২৪ ফেব্রুয়ারি রোববার সাপ্তাহিক ছুটির দিন। অফিস-আদালত সব বন্ধ। স্বভাবতই মিছিলের তৎপরতায় কিছুটা ঢিলেঢালা ভাব। এর মধ্যেই নতুন উত্তেজনার খোরাক মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার, শহীদদের স্মৃতি রক্ষার জন্য তৈরি। শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে নানা বয়সী মানুষের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে আসার মধ্য দিয়ে জনচেতনায় সরকারবিরোধী ক্ষোভের নয়া প্রকাশ। ঢাকার বাইরেও একইভাবে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।

একুশের ইতিহাস পাঠক জেনে অবাক হবেন যে ঢাকার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়াই জেলা ও মহকুমা শহরগুলোতে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের যে সূচনা, তখনো তা যথেষ্ট তীব্রতা নিয়ে সরকারের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে। ছাত্র-জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘাত অনেকটা নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু ছাত্র-জনতা নিজ লক্ষ্যে অটল।

একুশের একটি আকর্ষণীয় দিক ছিল লাল-কালো বর্ণমালায় সাজানো পোস্টারে স্লোগানের উজ্জ্বলতা। মেডিকেলছাত্র থেকে চারুকলার শিক্ষার্থী, এমনকি স্কুল-কলেজের আঁকিয়ে ছাত্রও সে সময় পোস্টার লেখার উৎসবে যোগ দিয়েছিল। অনভ্যস্তদের আঙুলে ফোসকা। সুদর্শন পোস্টারে ছেয়ে যায় শহর ঢাকার দেয়াল। আর মিছিলে ছাত্রদের হাতে ধরা ফেস্টুন। আশপাশের বাড়ির জানালা থেকে কৌতূহলী দৃষ্টি মিছিল-ফেস্টুনের দিকে নিবদ্ধ।

ঢাকাই জনতা যে একুশে নিয়ে তখনো উদ্বেল, তার প্রমাণ যেমন মিছিলে উপস্থিতি, তেমনি সরকারের প্রতি তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ভরা রসিকতা। দৈনিক *আজাদ*-এ তেমন ঘটনা ছাপাও হয়েছে। চৌকস বয়ানের সরস রসিকতায় ঢাকাই জবানের খ্যাতি তো তুলনাহীন। একুশে উপলক্ষে দেখা গেছে তেমন কিছু কিছু প্রকাশ। কে বলে আন্দোলনে তখন ভাটার টান? পুলিশ ও প্রশাসনের রক্তচক্ষু

উপেক্ষা করে ছোট-বড় যেসব ছাপাখানা একুশের লিফলেট-ইশতেহার সরবরাহ করেছিল, তাদের ভাষিক প্রেম ভোলার কথা নয়। সেসব দলিল কমই সংরক্ষিত হয়েছে। এমনই আমাদের ইতিহাস-সচেতনতা।

আন্দোলন যে তখনো আপন শক্তিতে সক্রিয়, তার আরেক প্রমাণ সরকারি প্রতিষ্ঠান ঢাকা বেতার কেন্দ্রে চার দিনব্যাপী পূর্ণ হরতাল। সেদিনও শহরের নানা স্থানে সরকারবিরোধী সভা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও প্রতিবাদে শামিল এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে অধ্যাপকদের সভায় গুলিবর্ষণের নিন্দা, দায়ী ব্যক্তিদের অপসারণ, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার এবং অবিলম্বে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে প্রস্তাব নেওয়া হয়। কাজেই 'আন্দোলনে ভাটার টান লেগেছে, আন্দোলন বন্ধের সময় হয়েছে'—দু-একজন নেতার এ-জাতীয় উক্তির কোনো ভিত্তি নেই। চলমান আন্দোলনের চিত্রচরিত্রের দিকে তাকালে এবং বিশ্লেষণ করে দেখলে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনে নেতৃত্বের আপসবাদী অংশ এ ধরনের ভূমিকাই নিয়ে থাকে, পরিস্থিতির সুযোগ তারা নিতে চায় না। এমন ঘটনা এ দেশের আন্দোলনে একাধিকবার দেখা গেছে।

সত্যই আন্দোলনের ওই পর্যায়ে নানা আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে বিভক্ত নেতৃত্ব পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। একমাত্রিক দাবির দুর্বলতা বুঝে নিয়ে বহুমাত্রিক জনস্বার্থনির্ভর কর্মসূচি গ্রহণের বিচক্ষণতা দেখাতে পারেনি তারা। দু-একজন নেতার অনুরূপ ভাবনা আমলে আনেনি নেতৃত্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। আইন পরিষদে যখন রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে সুপারিশ প্রস্তাব হয়েছে, তখন এই একক দাবি নিয়ে বেশিদূর যাওয়া সম্ভব ছিল না। এ সহজ সত্য ও আন্দোলনের দুর্বলতা সরকার বুঝলেও আমাদের নেতৃত্ব বুঝতে পারেনি অথবা বুঝতে চায়নি। হয়তো দূর-গন্তব্যে পৌঁছানোর ইচ্ছা তাদের ছিল না।

কিন্তু সরকার সুযোগের সদ্ব্যবহার ঠিকই করেছিল এবং তা ষড়যন্ত্র, মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের মাধ্যমে। জনমানসের পাকিস্তানপ্রীতির দুর্বলতা তারা পুরোপুরি কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর এদিনকার বেতার-বক্তৃতায় এসব অপতৎপরতার সূচনা। পাকিস্তানি শাসকদের চিরাচরিত পথ ধরে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ তোলেন, আন্দোলনের কারণে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন। তাঁর মতে, পাকিস্তান ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে রয়েছে দেশি-বিদেশি রাষ্ট্রদ্রোহী চক্র, রয়েছে তাদের অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ। তারা ব্যবহার করছে ভাষা আন্দোলনকে। তাদের পেছনে রয়েছে ক্ষমতাবঞ্চিত সুবিধাবাদী রাজনীতিক গোষ্ঠী। রয়েছে ভারতীয় মদদ। এ-জাতীয় মিথ্যাচারে ভরা লাখ লাখ কপি প্রচারপত্র সরকারি প্রেস থেকে ছাপিয়ে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য পাকিস্তান-অনুরাগী জনতার মগজ ধোলাই।

জনগণের অর্থ খরচ করে দলীয় স্বার্থে এমন কাজ সরকার করতে পারে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। চারদিকে আটঘাট বেঁধে একুশের মোকাবিলায় মাঠে নামেন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন। এ কাজে তাঁর সহায়ক চতুর প্রশাসন। সম্ভবত তাদের পরামর্শে হঠাৎ আইনসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করার ব্যবস্থা নেন তিনি। ভাষাবিষয়ক ঘটনাবলি ও বিরাজমান বিস্ফোরক পরিস্থিতির দায়ে তিনি তখন খলনায়কের ভূমিকায়। আইনসভার সদস্যদের নানামুখী প্রশ্নে তীরবিদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী জবাবদিহির দায় এড়াতে ওই ব্যবস্থা নেন। একটা ফ্রন্ট তো বন্ধ হলো। এরপর তার পাল্টা আক্রমণ।

একদিকে সে আক্রমণের লক্ষ্য ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী ও বিরোধী রাজনীতিক, অন্যদিকে পরোক্ষ আক্রমণ কূটকৌশলী প্রচারের চালে একুশে ও তার কারিগরদের চরিত্র হননের চেষ্টায়। একুশের নেতৃত্বে বিরাজমান বিভেদ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের দুর্বলতা মুখ্যমন্ত্রীর দুরভিসন্ধিমূলক কাজে সাহায্য করেছে। সরকারি দল মুসলিম লীগও একইভাবে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে আন্দোলনের চাপে কোণঠাসা সরকার আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণের নীতি গ্রহণ করে। শুরু হয় সর্বাত্মক প্রস্তুতি। তাদের পরবর্তী প্রতিটি পদক্ষেপে তা বুঝতে পারা যায়।

কঠোর দমননীতি সত্ত্বেও আন্দোলন চলছে

একুশের আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেরই জানার কথা যে ২৫ ফেব্রুয়ারি সোমবারও শহর ঢাকায় হরতাল-বিক্ষোভ অব্যাহত ছিল। মিছিলে মিছিলে স্লোগান অব্যাহত, বাড়িতে বাড়িতে কালো পতাকা উড়ছে। সত্যি বলতে কি, সরকার তখনো তাদের প্রশাসনিক ও নৈতিক কর্তৃত্ব উদ্ধার করতে পারেনি। সংবাদপত্রের ভাষ্যে দেখা যায়, 'কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অফিস-আদালত জনশূন্য। বাজার, দোকানপাট, ব্যাংক, সিনেমা ও খেলাধুলা সব বন্ধ।' অর্থাৎ পূর্ণ হরতালের সব আলামত উপস্থিত।

স্বভাবতই কর্তৃত্ব উদ্ধারে সরকারের মরিয়া হয়ে ওঠার কথা। সে উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নামে কথিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। কিন্তু এ কথাও সত্য যে আন্দোলন তখনো শান্তিপূর্ণ এবং তা মিছিলে-স্লোগানে সীমাবদ্ধ। হিংসাত্মক ঘটনার কোনো প্রকাশ নেই। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনেও তা স্পষ্ট। আন্দোলনের কারণে পাকিস্তান ধ্বংস হওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা যায়নি। তবু তেমন প্রচার ঠিকই চলেছে। চলেছে সরকার ও সরকারি দলের পক্ষ থেকে।

এ অবস্থায় সরকারের আক্রমণাত্মক পদক্ষেপের সূচনা সলিমুল্লাহ হলে পুলিশ-ইপিআর সেনাদের যৌথ হামলায়। উদ্দেশ্য মাইক ছিনতাই। হামলা ব্যর্থ হওয়ার পর হলের প্রভোস্ট ড. ওসমান গনির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত যৌথ বাহিনী মাইক হাতে পেয়ে যায়। তারা ফজলুল হক হল ও জগন্নাথ কলেজে হামলা চালিয়ে ছাত্রদের প্রচারযন্ত্র ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। মাইকের ওপর হামলার কারণ, এগুলো থেকে প্রাত্যহিক কর্মসূচি প্রচার ছাত্র-জনতার মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে এবং মানুষ ওই কর্মসূচি অনুযায়ী তাদের কর্তব্য নির্ধারণ করেছে। সে ক্ষেত্রে সরকার ছিল অসহায় দর্শক।

এ পর্যায়ে সরকারি আক্রমণ দ্বিমুখী নয়, ছিল বহুমুখী। তারা আন্দোলনের সম্ভাব্য সব উৎসেই হামলা চালায় এবং ব্যাপক গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে ছাত্র-জনতার মনে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। যুবলীগ অফিসে হামলাও একই কারণে। এ ছাড়া

আইনশৃঙ্খলা নষ্ট ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি হুমকির অজুহাত তুলে নিরাপত্তা আইনে সরকারবিরোধী লেখক, অধ্যাপক, রাজনীতিক অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। এমনকি চেষ্টা চলে ছোটখাটো মিছিল থেকে নেতৃস্থানীয় ছাত্র-যুবাদের গ্রেপ্তারের।

মুখ্যমন্ত্রীকে সংকট থেকে উদ্ধারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মাথাব্যথা কম ছিল না। এর সঙ্গে সংগতি রেখে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ এক বিবৃতিতে বলেন, 'প্রাদেশিকতা পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক।...এছলামে ভৌগোলিক সীমানা-সম্পর্কিত বিধিনিষেধের অনুমতি দেওয়া হয় নাই।' পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে পাকিস্তানি নেতাদের সবাই কমবেশি একই সুরে কথা বলেছেন। 'পাকিস্তান বিপন্ন, ইসলাম বিপন্ন, বিদেশি ষড়যন্ত্র' ইত্যাদি শব্দ তাঁদের মুখে হরহামেশা শোনা গেছে। সরকারবিরোধিতা তাঁদের চোখে হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রবিরোধিতা।

সরকারি দমননীতির কঠোরতার মধ্যেই টানা পাঁচ দিন সর্বাত্মক হরতালের পর মূলত ঢাকাই সরদারদের অনুরোধে এবং দিনমজুর ও দিনকর্মীদের কথা ভেবে হরতাল সাময়িক স্থগিত করা হয়। তা ছাড়া একটানা হরতাল-মিছিল এবং নতুন কর্মসূচির অভাব ও সরকারি দমননীতির পরিপ্রেক্ষিতে একুশের নেতৃত্বের জন্যও প্রয়োজন ছিল পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও নতুন কর্মসূচি দানের চিন্তাভাবনা। কিন্তু সে দায় পালনে ছাত্র-যুব নেতৃত্ব সফল হয়নি। অন্যদিকে 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' প্রবাদ সত্য প্রতিপন্ন করে বিলুপ্ত সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ সক্রিয় নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই ২৫ ফেব্রুয়ারি দুপুরে মেডিকেল হোস্টেলে এক বৈঠকে বসে। অনেক তর্কবিতর্কের পর সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীকে ৯৬ ঘণ্টার চরমপত্র দেওয়ার প্রস্তাব নেওয়া হয়।

অথচ এমন হঠকারী সিদ্ধান্তের পক্ষে কোনো যুক্তি ছিল না। 'এ ধরনের একতরফা সিদ্ধান্ত কেন নিলেন'—পরবর্তীকালে এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি কাজী গোলাম মাহবুব। 'এখন আর কিছু মনে নেই'—জবাবে এ কথাই বলেছিলেন তিনি। প্রশ্নকর্তা আবদুল মতিন ও লেখক। মুখ্যমন্ত্রী এ অদূরদর্শী পদক্ষেপের জবাব দিতে দেরি করেননি। দমননীতি আরও কঠোর হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারির প্রধান ঘটনা তাই কয়েকজন স্বনামখ্যাত অধ্যাপককে গ্রেপ্তার, সলিমুল্লাহ হলে হামলা ও গ্রেপ্তার, শেষ বিকেলে মেডিকেল হোস্টেল ঘেরাও করে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস এবং যত্রতত্র হামলা ও গ্রেপ্তারে সরকারি চণ্ডনীতির প্রকাশ। ওই চণ্ডনীতি যে কতটা বেসামাল মানসিকতার প্রতীক, তার প্রমাণ সলিমুল্লাহ হলে পুলিশি অভিযানের সময় পশ্চিম পাকিস্তানি সাংবাদিক, পত্রিকা সম্পাদক সুলেরি সাহেবকে গ্রেপ্তার। পরে অবশ্য তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সুলেরি ঠিকই বুঝে নেন পূর্ববঙ্গে কী ঘটছে।

এদিনের বিশেষ ঘটনা সরকারি উগ্রতার মুখেও গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ১২ নম্বর অভয় দাস লেনে মহিলাদের এক সভায় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া, শহীদদের

সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য প্রকাশের দাবি জানানো এবং সর্বদলীয় মহিলা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন কলেজ, মিটফোর্ডসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের এ আন্দোলনে ছিল বিশেষ ভূমিকা। অথচ বিষয়টি অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বেতার বক্তৃতা নিয়ে আত্মপ্রসাদে ভুগলেও ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাঁর ভূমিকা নিজের দলেও সমালোচনার সম্মুখীন হয়। একদিকে প্রথম সারির নেতাদের সমালোচনা, অন্যদিকে বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহসহ একাধিক জেলায় মুসলিম লীগ সদস্যদের পদত্যাগ তাঁকে আরও জবাবদিহিতার মুখে ফেলে দেয়। তা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী দমননীতির পথ থেকে সরে আসেননি। পাকিস্তানি স্টাইলে ষড়যন্ত্র ও মিথ্যাচারের নীতি নিয়েই চলতে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা এবং ছাত্রদের হলত্যাগের নির্দেশ (২৭ ফেব্রুয়ারি) সম্ভবত তাঁর জিহাদি মনোভাবের সর্বশেষ প্রকাশ ঘটায়।

এর মধ্যে আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ায় সবাই তখন আত্মগোপনে। এ অবস্থায় আন্দোলন চলতে পারে না। ঢাকাই আন্দোলন তাই স্তিমিত হয়ে আসে মূলত ২৭ ফেব্রুয়ারির পর থেকে। চলে খুব ধীরপায়ে ৫ মার্চের হরতাল পর্যন্ত। এরপর ৯ মার্চ শান্তিনগরের বৈঠক থেকে সংগ্রাম পরিষদের মূল নেতাদের গ্রেপ্তারের পর ঢাকায় আন্দোলন শেষ হয়ে আসে। কারণ, তাঁরাই ছিলেন আন্দোলন পরিচালনার প্রধান কারিগর। কিন্তু ঢাকার বাইরে আন্দোলন এর পরও পূর্ণ উদ্যমে চলেছে এবং কোথাও কোথাও যথেষ্ট তীব্রতায়।

ঢাকার বাইরে ভাষা আন্দোলন

নানা অবাঞ্ছিত কারণে ঢাকায় ভাষা আন্দোলন যখন নিস্তেজ, তখনো দেশের অন্যত্র আন্দোলন যথারীতি এগিয়ে চলেছে। পুলিশি জুলুম ছাত্র-জনতার প্রতিবাদ বন্ধ করতে পারছে না। কোথাও কোথাও আন্দোলনে প্রকাশ পাচ্ছে বিস্ফোরক চরিত্রের তীব্রতা; যেমন—নারায়ণগঞ্জ। এ ছাড়া রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, চট্টগ্রাম, যশোর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, নোয়াখালীসহ প্রতিটি জেলা ও মহকুমায় ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা ছিল লক্ষ করার মতো। অথচ ঢাকার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে এদের সঙ্গে যোগাযোগ সামান্যই হয়েছে। এরা একুশের কর্মসূচি নিয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতেই আন্দোলনে নেমেছে, সাফল্য পেয়েছে। তবে এ কথাও ঠিক যে ঢাকার বাইরে শহরগুলোতে দমননীতি ও পুলিশি জুলুম ছিল অনেক বেশি। গ্রেপ্তার, নির্যাতনও তেমনই।

এ প্রসঙ্গে নারায়ণগঞ্জে একুশের আন্দোলন বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। একুশে ফেব্রুয়ারি সেখানে যথারীতি শুরু হলেও ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা একপর্যায়ে অল্পসময়ের জন্য হলেও গণ-আন্দোলনের চরিত্র অর্জন করে। এর কারণ, স্থানীয় মর্গান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগমের অনমনীয় ভূমিকা। ছাত্রীদেরই নয়, শহুরে মহিলাদেরও আন্দোলনে যুক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল অনন্য। ফেব্রুয়ারির উত্তাল দিনগুলোতে প্রতিটি সভা-সমাবেশ ও মিছিলের পুরোভাগে তাঁকে দেখা গেছে। তাই তাঁর ওপর নজর পড়ে পুলিশের। গ্রেপ্তার হন তিনি। তাঁকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ শুরু হলে চাষাঢ়ায় পুলিশ-জনতা সংঘর্ষের সূত্রপাত। শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী কৌশলে তাঁকে ঢাকায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। নারায়ণগঞ্জে আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন শামসুজ্জোহা, সফি হোসেন, আলমাস আলী, খানবাহাদুর ওসমান আলী প্রমুখ।

ময়মনসিংহেও ভাষা আন্দোলন যথেষ্ট তীব্রতা ও ব্যাপকতা নিয়ে সংঘটিত হয়। রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া, হাতেম আলী তালুকদার প্রমুখ নেতার চেষ্টায় আন্দোলন মহকুমা শহর ছাড়িয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। শহরে মোনায়েম খাঁর

উর্দুর পক্ষে প্রচার সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে ব্যর্থ হয়। কুমিল্লা শহরও বিশাল সমাবেশ ও মিছিলে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির পাশাপাশি মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে। জেলার প্রতিটি মহকুমায় আন্দোলনের তীব্রতা এমনই ছিল যে এর প্রভাব গ্রামের শিক্ষায়তনেও পড়ে। মহকুমা শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়াও ব্যতিক্রম ছিল না।

চট্টগ্রামে ভাষা আন্দোলন বিশেষ মাত্রা পেয়ে যায় ঢাকায় ছাত্র-জনতার ওপর গুলিবর্ষণের খবর পৌঁছানোর পর। প্রসঙ্গত মাহবুব-উল-আলম চৌধুরীর 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' কবিতাটির উল্লেখ করতে হয়। চট্টগ্রামে ভাষা আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল, স্থানীয় শ্রমিক নেতাদের অংশগ্রহণ। তা ছাড়া সর্বস্তরের রাজনৈতিক নেতার একাত্মতায় আন্দোলনের সর্বজনীন চরিত্র ফুটে ওঠে। মাদ্রাসাছাত্র আহম্মেদুর রহমান আজমীর আন্দোলনে অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যা তাঁর জীবনের ধারা পাল্টে দেয়।

রাজশাহীতে বাম-ডান-মধ্যপন্থী বিভিন্ন সংগঠনের সমন্বয়ে যে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়, সে কমিটির উদ্যোগে পরিচালিত হয় আন্দোলন। একুশে ফেব্রুয়ারি দিনব্যাপী হরতাল, ভুবনমোহন পার্কে সভা ও মিছিলের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের সূচনা। এ আন্দোলনে ছাত্রীদেরও অংশ নিতে দেখা গেছে। পূর্বোক্ত জেলা শহরের মতো এখানে ব্যাপক ধরপাকড়ের ঘটনা আন্দোলনের তীব্রতা বাড়িয়ে দেয় এবং তা ছড়িয়ে পড়ে দূর এলাকায়। স্থানীয় সূত্র মতে, একুশের মধ্যরাতে তৈরি শহীদ মিনার পরদিন সকালে পুলিশ ভেঙে ফেলে।

বগুড়ায় ভাষা আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল সর্বস্তরের সংগঠনের অংশগ্রহণ। যেমন যুবলীগ, শ্রমিক ইউনিয়ন, আওয়ামী লীগ ও তমদ্দুন মজলিস, তেমনি কৃষক সংগঠন ও বামপন্থী ছাত্র-যুবা-রাজনীতিক, এমনকি স্থানীয় শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, সাহিত্যিকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ। একাধিক জেলার মতো এখানেও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা প্রকাশ্যে আন্দোলন পরিচালনায় অংশ নেন। বগুড়ায় প্রথম শহীদ মিনার তৈরি হয় ১৯৫৩ সালে।

আন্দোলনের ঐতিহ্য নিয়ে যেমন পাবনা, তেমনি যশোর, খুলনাও রাজনৈতিক ঐতিহ্যের ধারায় ভাষা আন্দোলনে অংশ নেয়। তবে এসব ক্ষেত্রে দমননীতির তীব্রতায় অথবা অন্য কোনো কারণে আটচল্লিশের আন্দোলন বায়ান্নর তুলনায় ছিল জঙ্গি চরিত্রের। তুলনায় সিলেটে সাতচল্লিশের নভেম্বর থেকে বিক্ষোভ শুরু হয় এবং বায়ান্নর ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে পীর হাবীবুর রহমানকে আহ্বায়ক করে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ঢাকায় ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সিলেট শহরে হাজারো মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। পরদিন হরতাল, পরে লাগাতার আন্দোলন। সভা-সমাবেশ-মিছিল জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছাত্রী ও মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ।

দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতেও ভাষা আন্দোলন একই উদ্দীপনায় প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে ওঠে। যেমন আটচল্লিশে, তেমনি বায়ান্নতে ফরিদপুরের আন্দোলন অন্য জেলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে। তবে নোয়াখালী ও ফেনীতে একুশের আন্দোলন অপেক্ষাকৃত জোরকদমে চলেছে। উভয় ক্ষেত্রেই যুবলীগ, ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিস ও কংগ্রেসের মতো সংগঠন সর্বদলীয় ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। এবং তা একুশে ফেব্রুয়ারি থেকেই।

রংপুর, দিনাজপুর উভয় জেলাতেই আন্দোলন সর্বদলীয় ভিত্তিতে জোরদার হয়ে উঠলেও এতে বাড়তি শক্তি জোগায় বাম রাজনীতিকদের তৎপরতা। এ দুই জেলায় আন্দোলন যেমন শক্তিমান, তেমনি প্রশাসনিক দমননীতিও ছিল তীব্র। তা সত্ত্বেও হরতাল, সভা-সমাবেশ, মিছিল যে আলোড়ন তোলে, তা জনচেতনা স্পর্শ করে। প্রশাসন তাই কিছুটা পিছু হটতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে বরিশালে আন্দোলন মূলত বায়ান্নতে এবং তা ছাত্রলীগ, যুবলীগের তৎপরতায় মূলত বিএম কলেজকে ঘিরে। এখানে ছাত্রীদেরও ছিল বিশেষ ভূমিকা এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি একটি শহীদ মিনারও তৈরি হয়। বরিশাল শহরের আন্দোলনও জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সংক্ষিপ্ত এ বিবরণ থেকে বোঝা যায় একুশের ভাষা আন্দোলন গোটা প্রদেশে কতটা ব্যাপক ভিত্তিতে প্রকাশ পেয়েছিল। তাই এর প্রভাব পড়েছিল ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে স্পর্শ করা, এতটা ব্যাপকভিত্তিক আন্দোলন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম। এখানেই বায়ান্নর রক্তে রাঙানো ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য।

একুশের চিত্র রচনায় দেশি-বিদেশি সংবাদপত্র

বর্তমান সময়ে সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেল সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি ঘিরে জাতীয় জীবনে এক বিশাল তাৎপর্যময় ভূমিকা পালন করে চলেছে। পাল্টে দিচ্ছে অনেক কিছু। আর সে পরিবর্তন নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। কিন্তু পঞ্চাশের দশকে এ দেশে প্রচারমাধ্যম হিসেবে বেতার, গুটিকয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রই ছিল একমাত্র সম্বল। বেতার তো সরকারের নিয়ন্ত্রণে, সেখানে সরকারবিরোধী কোনো কিছুর প্রবেশ সম্ভব ছিল না। প্রধান দুটি দৈনিক সরকার-সমর্থক আর *পাকিস্তান অবজারভার* যুক্তিহীন কারণে নিষিদ্ধ। এমন পরিস্থিতিতে তৈরি হয়েছে স্বদেশি সংবাদপত্রে একুশের চালচিত্র।

বায়ান্নতে ভাষা আন্দোলনের সংবাদচিত্র পক্ষে বা বিপক্ষে যেসব কাগজে প্রকাশ পেয়েছিল, তার মধ্যে *আজাদ, সংবাদ, মর্নিং নিউজ, ইনসাফ, ইত্তেফাক, নওবেলাল* ও *সৈনিক* উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ছিল *ইত্তেহাদ, চাষী* ও *জিন্দেগী*র মতো গুটিকয় কাগজ। এগুলো ভাষা আন্দোলনকে নিজ নিজ নীতি অনুযায়ী চিত্রিত করেছে। তবে এ আন্দোলন পশ্চিম পাকিস্তান ও কলকাতার সংবাদপত্রগুলোকেও স্পর্শ করেছিল।

দৈনিক *আজাদ* মওলানা আকরম খাঁ পরিচালিত মুসলিম লীগ রাজনীতির কট্টর মুখপত্র হওয়া সত্ত্বেও দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে আন্দোলনের প্রথম দিকে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। কিন্তু আন্দোলনে ভাটার টান লাগার সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকীয় নীতির ভোল পাল্টে যায়। তবে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষই ছিল *আজাদ*। শুরুতে 'তদন্ত চাই', 'পদত্যাগ করুন' শীর্ষক সম্পাদকীয় লিখে চমক লাগায় পত্রিকাটি।

ইংরেজি দৈনিক *মর্নিং নিউজ* ভাষাবিষয়ক সংবাদ পরিবেশনের কুখ্যাতির জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে ওঠে। খাজা পরিবারের এই পত্রিকা 'ভয়েস অব নেশন' (জাতির কণ্ঠস্বর) পরিচয় নিয়ে একদেশদর্শিতায় সাংবাদিকতার সব নীতিনৈতিকতা বিসর্জন দিয়েছিল। তাই একুশের আন্দোলন নিয়ে এমন মিথ্যাচারও সম্ভব হয়: 'ঢোটিস রোমিং ঢাকা স্ট্রিটস' (ধুতিপরা লোকেরা ঢাকার রাজপথে ঘুরছে)। ক্ষুব্ধ স্থানীয় তারুণ্য এ পত্রিকার ছাপাখানা জুবিলি প্রেস পুড়িয়ে দেয়।

একই সঙ্গে সরকার-সমর্থক দৈনিক *সংবাদ* এতটা না হলেও বাংলাবিরোধিতার জন্য ছাত্রদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। অথচ কবির সাহেবদের এ পত্রিকায় কাজ করতেন কিছুসংখ্যক স্বনামখ্যাত গণতন্ত্রী ও বামপন্থী সাংবাদিক। তবু একদেশদর্শী ভূমিকার কারণে একুশের তুঙ্গপর্যায়ে *সংবাদ* অফিসে কয়েক দফা হামলা চালায় বংশালের স্থানীয় যুবারা। কিন্তু পুলিশের তৎপরতায় সংবাদ অফিস রক্ষা পায়। *পাকিস্তান অবজারভার* মুসলিম লীগের রাজনীতিক হামিদুল হক চৌধুরীর পত্রিকা হওয়া সত্ত্বেও সম্ভবত দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তবে *আজাদ*-এর মতো ভোল পাল্টায়নি। 'What East Bengal Thinks' বা 'Make Protest Day A Success'-এর মতো সংবাদ পরিবেশন করে *অবজারভার* তেমন প্রমাণ রেখেছে। দুঃখজনক যে একুশের উত্তেজক দিনগুলোতে বাংলা ভাষার পক্ষে দাঁড়ানোর সুযোগ পায়নি *অবজারভার*। খাজা নাজিমুদ্দিনের স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় (ছদ্ম ফ্যাসিজম) লেখার দায়ে ১২ ফেব্রুয়ারির পর *অবজারভার* সরকারি নির্দেশে বন্ধ হয়ে যায়।

দৈনিক *ইনসাফ* তার সীমিত শক্তি-সামর্থ্য নিয়েই একুশের পক্ষে বলিষ্ঠ ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। সংবাদ পরিবেশনে কিছু ভুলত্রুটি সত্ত্বেও এর সম্পাদকীয় ছিল বিশ্লেষণধর্মী, যুক্তিনিষ্ঠ। যেমন—সরকারকে কাজী গোলাম মাহবুবের ৯৬ ঘণ্টার চরমপত্র দেওয়ার বিরুদ্ধে *ইনসাফ*-এর বক্তব্য ছিল যুক্তিনির্ভর ও আন্দোলনের স্বার্থনির্ভর। তেমনি ২২ ফেব্রুয়ারি *আজাদ* সম্পাদকীয় কলামের শিরোনাম যেখানে 'তদন্ত চাই', *ইনসাফ* সেখানে লেখে 'বিচার চাই'—যা ভাষায় ও বক্তব্যে প্রতিবাদী চরিত্রসম্পন্ন।

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক*ও সম্পাদকীয় লেখে 'বিচার চাই'। ভাসানীর চড়া সুরের বিবৃতির সঙ্গে সংগতি রেখে এতে বলা হয়: 'দেশের অযুত কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া আমাদের ঘোষণা শুধু ছাত্র-জনতার ঘাতক সরকারী কর্মচারীদের নয়, এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের হোতা সরকারের বিচার চাই প্রকাশ্য গণ-আদালতে।' একই দাবি ছিল 'ফায়ার ঈটার মুলানা' ভাসানীরও।

সাপ্তাহিক *নওবেলাল*-এর ভাষাও ছিল শাণিত ও কাব্যিক। এর সম্পাদকীয় 'বুলেটের মুখে গেয়ে গেল যারা' তেমন প্রমাণ রেখেছে। 'ঢাকার বুকে যাহারা জালিনওয়ালাবাগের পুনরভিনয় করিল তাহাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের ভাষা আমাদের নাই। সমগ্র জাতির সহিত আমরাও এই রক্তখেকো নরদানবদের কুকর্মের প্রতিবাদ করিতেছি' ইত্যাদি। এরপর কিছু কাব্যময় পঙ্‌ক্তি। সাপ্তাহিক *সৈনিক*-এর ভাষায়ও ছিল প্রবল আবেগ। যেমন সম্পাদকীয় নিবন্ধে, তেমনি সংবাদ পরিবেশনে। একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা সম্পর্কে ২৩ ফেব্রুয়ারি *সৈনিক*-এ লেখা হয়: 'শহীদের তাজা রক্তে রাজধানী ঢাকার রাজপথ রনজিত।' ভাষা এরপর যথেষ্ট আবেগবহুল। কিন্তু

তথ্যগত কিছু ত্রুটি *সৈনিক*-এ প্রায়ই দেখা গেছে। দেখা গেছে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ক্ষেত্রে। তবু *সৈনিক* যথেষ্ট আবেগ নিয়ে একুশের ঘটনাবলি জনসমক্ষে প্রচারের চেষ্টা করেছে।

অবাক হওয়ার মতো ঘটনা যে পূর্ববিরোধিতা ভুলে পশ্চিম পাকিস্তানি পত্রিকা দৈনিক *ডন* একুশে নিয়ে 'ঢাকার মর্মান্তিক ঘটনা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখে : 'বাংলা ভাষাকে উর্দুর সমমর্যাদা দেওয়া হইলেও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের মোটেই আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না।' অন্যদিকে করাচির *ইভনিং টাইমস* ও *ইভনিং স্টার* ঢাকায় গুলিবর্ষণ সম্পর্কে তদন্তের দাবি করে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। ডাকসাইটে সাংবাদিক-সম্পাদক জেড এ সুলেরির এ সময় ঢাকা সফর হয়তো এর কারণ। তিনি এ সময় এক বিবৃতিতে বলেন, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করা বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার মতো। এটা কোনো সুবিধাদানের বিষয় নয়। পেশোয়ার থেকে প্রকাশিত *খাইবার মেইল*-এ ছিল একই সুর। ওই পত্রিকায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

কলকাতার বিশিষ্ট দৈনিক পত্রিকা *আনন্দবাজার* একুশের ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলি যথারীতি ছেপেছে। পুলিশের গুলিবর্ষণ সম্পর্কে তাৎক্ষণিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ওই পত্রিকায় ২২ তারিখের শিরোনাম : 'ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকারী ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ। ১ জন নিহত ও ১৬ জন আহত : ৮ জনের অবস্থা গুরুতর'। সম্ভবত রফিকউদ্দিনের তাৎক্ষণিক মৃত্যুর খবরই প্রতিবেদক পত্রিকা অফিসে পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য পরদিনের শিরোনামে তা সংশোধিত হয়ে মোটামুটি ঠিকভাবেই এসেছে। শিরোনাম : 'ঢাকায় ছাত্রদের ওপর পুনরায় গুলিবর্ষণ/বৃহস্পতি ও শুক্রবার মোট ৯ জন নিহত'। বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশনের পর ২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জানাজায় 'অবিভক্ত বাঙ্গলার ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী জনাব এ কে ফজলুল হক এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ভূতপূর্ব সম্পাদক জনাব আবুল হাসেম'-এর যোগদানের খবর দেওয়া হয়েছে।

২৩ ফেব্রুয়ারি *আনন্দবাজার*-এ সম্পাদকীয় শিরোনাম 'ভাষা দমনে গুলি'। ঘটনার বিশদ আলোচনা শেষে বলা হয়েছে : 'পূর্ববঙ্গের মাতৃভাষার দাবিকে এবং জনসাধারণের একটি গণতন্ত্রসম্মত দাবিকে প্রথমে পুলিশের সাহায্যে তাহার পর সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে স্তব্ধ করার পন্থা পাকিস্তান সরকার গ্রহণ করিলেন, এই দম্ভ, অবিবেচনা ও নিষ্ঠুরতার পরিণাম কল্পনা করিয়া আমরা দুঃখবোধ করিতেছি' (উদ্ধৃতি, সুকুমার বিশ্বাস, 'বাংলাদেশের ভাষা-আন্দোলনে কলকাতার সংবাদপত্র' থেকে)। এ ছাড়া *যুগান্তর*, *মতামত*, এমনকি *স্বাধীনতা*য়ও তথ্যনির্ভর সংবাদ ও বাংলা রাষ্ট্রভাষার পক্ষে সম্পাদকীয় মতামত ছাপা হয়েছে।

দৈনিক *স্টেটসম্যান* পত্রিকায়ও একুশে ও পরবর্তী কয়েক দিনের ঘটনার বিবরণ যথাযথভাবে ছাপা হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের ওপর পুলিশের

গুলিবর্ষণ সম্পর্কে ২২ ফেব্রুয়ারি *স্টেটসম্যান*-এ শিরোনাম : 'POLICE FIRES ON STUDENTS IN DACCA: DEMONSTRATION OVER LANGUAGE QUESTION: PROTEST IN ASSEMBLY'. বিস্তারিত প্রতিবেদনে একজনের মৃত্যু ও দুজনের গুরুতর আহত হওয়ার তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে ৬০ জন আহত ও প্রায় ১০০ জন ছাত্রের গ্রেপ্তার হওয়ার খবর। এ ছাড়া ছাত্র-পুলিশের ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ি, তর্কবাগীশসহ কয়েকজন এমএলএর পরিষদ কক্ষ ত্যাগ, এমনকি মেডিকেল হোস্টেল থেকে মাইকে প্রচারের ঘটনাও বাদ যায়নি। ২২ ফেব্রুয়ারি গুলিতে নিহত হওয়ার ঘটনাও খবরে স্থান পেয়েছে। ২৪ ফেব্রুয়ারি সম্পাদকীয় কলামে ঘটনার জন্য সরকারের অদূরদর্শিতাকে দায়ী করে বলা হয়েছে, এ ধরনের রক্তপাত দুঃখজনক এবং এর কোনো প্রয়োজন ছিল না (নিজস্ব সংগ্রহ থেকে)।

এভাবে দেশি-বিদেশি পত্রপত্রিকায় একুশের ঘটনাবলি প্রকাশ পেয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংবাদচিত্র তথ্যনিষ্ঠ। সেখানে রয়েছে ভাষার দাবির প্রতি সমর্থন এবং গুলিবর্ষণ ও সরকারি আতিশয্যের বিরোধিতা। স্বদেশে সরকার-সমর্থক কাগজই শুধু আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে এবং এ বিষয়ে *মর্নিং নিউজ* রীতিমতো কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। বাঙালি-বিরোধিতার জন্য *মর্নিং নিউজ* তাই বিভিন্ন সময়ে আক্রান্ত হয়েছে। তাতে প্রকাশ পেয়েছে ছাত্র-জনতার ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ।

কী পেয়েছি একুশের আন্দোলন থেকে

এ দেশে ভাষা আন্দোলনের সূচনা সুস্পষ্টভাবে আটচল্লিশের মার্চ থেকে হলেও এর আগে বিচ্ছিন্নভাবে বিক্ষোভ ও লেখার মাধ্যমে মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার সচেতন প্রয়াস আন্দোলনের সহায়ক পটভূমি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। চল্লিশের দশকের শেষ দিকে পাকিস্তান নামের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যখন প্রায় নিশ্চিত, তখন থেকেই মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের অনেকে বলতে থাকেন, উর্দুই হবে ভবিষ্যৎ পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ ধরনের বক্তব্যে উদ্বিগ্ন কিছুসংখ্যক বাঙালি সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবি নিয়ে সোচ্চার হন। সাতচল্লিশের শেষ দিকে একাধিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি নিয়ে যে বিক্ষোভ, তাতে সীমাবদ্ধ পরিধিতে হলেও ভাষিক চেতনার প্রকাশ বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

পাকিস্তান সরকারের পূর্বোক্ত বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে যে ভাষিক বিক্ষোভ আটচল্লিশের মার্চে আন্দোলনে পরিণত, সেই ধারাবাহিকতায় বায়ান্নর ছাত্র আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ নেয়। গোটা পূর্ববঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে। বলা যায়, এটা ছিল এক ধরনের ভাষিক উপপ্লব। ফলে সরকারকে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে বাংলার পক্ষে সুপারিশ প্রস্তাব পাস করতে হয়। কিন্তু গণপরিষদে মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য নূর আহমদের বাংলা রাষ্ট্রভাষার পক্ষে আনা প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। স্বয়ং নুরুল আমিন, নাজিমুদ্দিন ও দলের অন্য সবাই বাংলার বিরুদ্ধে ভোট দেন। ভাষিক বিশ্বাসঘাতকতার চমৎকার নজির রাখেন তাঁরা। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি নিয়ে একাধিকবার এ ধরনের প্রতারণা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন মুসলিম লীগ দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা।

একুশের আন্দোলন বাংলার দাবি আদায়ে তাৎক্ষণিক জয় পায়নি। তবু এর ধারাবাহিক তৎপরতা ওই দাবির পক্ষে জোরালো পটভূমি তৈরি করে। ১৯৫২ সালের ২৭ এপ্রিল থেকে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সম্মেলন এর প্রমাণ। পরবর্তী বছরগুলোতে একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ দিবস পালন দেশের রাজনৈতিক-

সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যে গণতান্ত্রিক ও ভাষিক চেতনার বিস্তার ঘটায়, বাংলার পক্ষে যে জনসমর্থন তাতে প্রকাশ পায়, সে প্রভাবে পূর্ববঙ্গের সাধারণ নির্বাচনে (১৯৫৪) যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার এককাট্টা বিজয় এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ভরাডুবি নিশ্চিত হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগের পক্ষে জনসমর্থন প্রায় শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়ায়। পূর্ববঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে।

কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসকদের ষড়যন্ত্রে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অকালমৃত্যু হলেও একুশে-উত্তর প্রভাবে জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিবাদী চেতনার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রকাশ ক্রমেই বাড়তে থাকে। হয়তো এসব লক্ষ করে পাকিস্তান গণপরিষদে ২৯ ফেব্রুয়ারি (১৯৫৬) ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের নতুন সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারায় বলা হয়, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু ও বাংলা।' কিন্তু বাংলার ব্যবহার ঠেকাতে এই বলে শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় যে সরকারি কাজে আরও ২০ বছর ইংরেজি ব্যবহৃত হবে। এরপর বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

বাংলা রাষ্ট্রভাষাবিষয়ক ওই অর্জনের বাইরে একুশে আমাদের জাতীয় জীবনে যা দিয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে এক নয়া চেতনার প্রকাশ, যা একাধারে গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিবাদী চরিত্রের। একইভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনুরূপ চেতনার প্রকাশ ঘটেছে এবং তা নানামুখী বাধা সত্ত্বেও। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের জনস্বার্থনির্ভর স্লোগান এখন পর্যন্ত পুরোপুরি অর্জিত না হলেও এর রাজনৈতিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

এ ছাড়া বাঙালির জাতীয়তাবোধক আত্ম-অন্বেষা ও আত্মচেতনার ধারা একান্তভাবে একুশের দান। এ ধারায় সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী মনোভাবের প্রকাশ ক্রমেই বিস্তার লাভ করে, বিশেষ করে শিক্ষিত মহলে। এমন এক ইতিবাচক জাতীয়তাবোধের প্রকাশ ঘটেছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী উচ্চারণে: 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও'। ওই আহ্বান দাঙ্গা রোধে বিশেষ ভূমিকা রাখে এবং এ ক্ষেত্রে আমির হোসেন চৌধুরীর শহীদ হওয়ার ঘটনাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ওই মানবিক চেতনার বলিষ্ঠ প্রকাশ বিস্মিত ও বিচলিত করেছিল পাকিস্তানের অবাঙালি-প্রধান কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীকে। তাই ষাটের দশকের অধিকাংশ সময়জুড়ে চলেছে সামরিক শাসন। আর পাকিস্তানি শাসকশ্রেণীর বরাবর চেষ্টা ছিল পূর্ববাংলায় ক্রমবর্ধমান গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ধর্মীয় চেতনার প্রভাবে বিনষ্ট করে দেওয়ার। তাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি।

আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এ কথা সত্য যে পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশকজুড়ে একুশের চেতনা 'শহীদ দিবস' পালনের মধ্য দিয়ে আধিপত্যবাদী পাকিস্তানি শাসক শক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের প্রেরণা জুগিয়েছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটাতে সাহায্য করেছে। স্বৈরশাসন বা সামরিক শাসনও তা রুখতে পারেনি। তাই একুশের ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার

অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই ছিল না, ছিল গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের নেপথ্য শক্তি। এ শক্তির ধারাবাহিকতায় সম্ভব হয়েছিল ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন, এমনকি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধ। আর ওই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন ভাষিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

একুশে এভাবে আমাদের জাতীয় জীবনের নানামাত্রিক অর্জনে অবদান রেখেছে। একুশের স্মারক স্থাপত্য শহীদ মিনার এখনো স্বাধীন বাংলাদেশে হয়ে আছে সব ধরনের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতীক ও প্রেরণা। তাই দলমত-নির্বিশেষে সব গণতান্ত্রিক শক্তিরই যাত্রা শুরু করতে হয় শহীদ মিনার থেকে। তা ছাড়া বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এদিক থেকে ভিন্ন মাত্রার অর্জন একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটিকে ১৯৯৯ সালে একটি বৈশ্বিক সংস্থার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি, যা আমাদের জন্য গর্ব ও অহংকারের বিষয়।

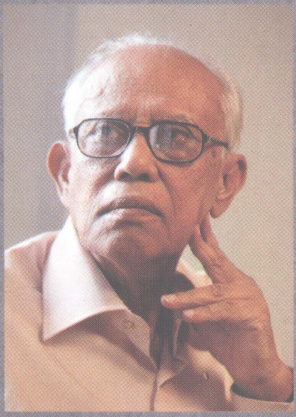

প্রাবন্ধিক, কবি ও কলামিস্ট হিসেবে খ্যাত আহমদ রফিক (জন্ম ১৯২৯) ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতির আকর্ষণে সমভাবে আলোড়িত ছিলেন। তিনি বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে তাঁর শিক্ষাজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। পেশাগতভাবে শিল্প ব্যবস্থাপনার সঙ্গে একদা যুক্ত থাকা সত্ত্বেও মননের চর্চাতেই তিনি অধিক সমর্পিত। এখন পুরোপুরি সাহিত্যকর্মে সক্রিয়। একাধিক সাহিত্য ও বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদনা, প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত। সক্রিয় রয়েছেন বিভিন্ন সামাজিক কর্মযজ্ঞে। রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র ট্রাস্টের তিনি প্রতিষ্ঠাতা, বাংলা একাডেমীর ফেলো এবং বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির জীবনসদস্য। তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *শিল্প সংস্কৃতি জীবন* (১৯৫৮), *আরেক কালান্তর* (১৯৭৭), *ভাষা আন্দোলন : ইতিহাস ও তাৎপর্য* (১৯৯১), *রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প* (১৯৯৬), *রবীন্দ্রভুবনে পতিসর* (১৯৯৮), *নির্বাচিত কলাম* (২০০০), *একাত্তরে পাকবর্বরতার সংবাদভাষ্য* (২০০১), পথ চলতে যা দেখেছি ইত্যাদি। কবিতাগ্রন্থের সংখ্যা আট। এ ছাড়া রয়েছে Selected Poems ও নির্বাচিত কবিতা। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশ। তিনি ১৯৭৯ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯২ সালে অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার পান। সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৯৫ সালে তিনি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার একুশে পদকে ভূষিত হন। কলকাতার টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে পেয়েছেন 'রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য্য' উপাধি।

প্রচ্ছদ শিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী

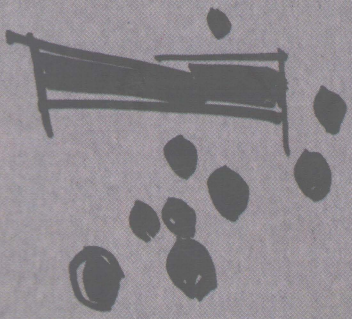

সহজ ভাষায় ছোট পরিসরে ভাষা আন্দোলনের নানা তথ্য ও ঘটনা নিয়ে লেখা হয়েছে এই বই। লেখক ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। তাঁর নিরপেক্ষ ও ইতিহাসনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বইটিতে ভাষা আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের সন্ধান মেলে।

ISBN 978-984876503-6